পরিবেশ বান্ধব বাগদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা চাষী সহায়ীকা

আবদ্ধ চাষ পদ্ধতি বা সিএসটি (Closed System Technology)

Prepared by:
World Fish Center (WFC)

Facilitated by:
PRICE-USAID

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরন, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা আজ সর্বজন বিদিত এবং স্বীকৃত। দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় ৫% চিংড়ির অবদান এবং রপ্তানী পণ্যের তালিকায় এর অবস্থান দ্বিতীয়।

খাদ্য হিসাবে সারা বিশ্বে চিংড়ি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করায় বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচেছ। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সারা বিশ্বে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচেছ। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক উৎস হতে নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থনৈতিক এলাকাসহ সামুদ্রিক জলাশয়ের আয়তন প্রায় ১.৬০ লক্ষ বর্গ কিঃ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও খামার থেকে এর উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচেছ। তটরেখা বরাবর ২০০ লামিটার। উপকূলীয় বাগদা চিংড়ি খামারের সংখ্যা প্রায় ৪২,০০০ যার আয়তন প্রায় ১,৭০,০০০ হেক্টর। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বিশ্বে উৎপাদিত চিংড়ির পরিমাণ ৪২ লক্ষ মেঃ টন আর বাংলাদেশের উৎপাদন ১,৫২,৫২০ মেঃ টন (বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৩.৬%)। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ চিংড়ি রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে বিশ্ব বাজারে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮২ সালে চিংড়ি খামারের আয়তন ছিল ৪০,০০০ হেক্টর আর তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালে হয়েছে ২ লক্ষ হেক্টরের উপরে (গলদা ৪০,০০০ হেঃ সহ)। ১৯৭৫ সালে যেখানে চিংড়ি রপ্তানী হত ৪,০০০ মেঃ টন বর্তমানে ২০০৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪৩,০০০ মেঃ টন। ১৯৮১-৮২ সালে চিংড়ি রপ্তানী করে ৯০.৫ কোটি টাকা আর তা ২০০৩-২০০৪ সালে হয়েছে ২১৫৩ কোটি টাকা। প্রাকৃতিক পরিবেশে জৈবিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে চিংড়ি উৎপাদিত হওয়ায় বিশ্ব বাজারে এর গুণগতমানের সুনাম ও চাহিদা আছে। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের আগে এসব জমিতে বছরে একটি করে আমন ধানের ফসল উৎপাদিত হত। ধান কাটার পর খালি জায়গা গরু-ছাগলের চারন ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছ আহরণ করা হত। ধানের উৎপাদন ও বিক্রী মুল্য কম হওয়ায় অধিকাংশ লোক দরিদ্র ছিল। এখন ক্ষুদ্র ও বড় চিংড়ি চাষী এককভাবে বা সমবায় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করে খুবই লাভবান হচ্ছে। চিংড়ি চাষের ফলে জমিতে জৈব পর্দাথের যোগানের কারনে চিংড়ি চাষ উত্তর খামারে ধানের উৎপাদন ভাল হচ্ছে। এমনকি একই জমিতে চিংড়ির পরে সাদা মাছ, গলদা ও ঘেরের পাড়ে সাক-সব্জি চাষ করে চাষীরা বেশি লাভবান হচ্ছে।

ক্ষেত্র	সংখ্যা/	আয়তন	কর্মসংস্থান সংখ্যা
১। বাগদা খামার	৪২,০০০	১,৭০,০০০	আত্মকর্মসংস্থান-১,০০,০০০ কর্মচারী-১,০০,০০০
২। গলদা খামার	১,২০,০০০	৪০,০০০	আত্মকর্মসংস্থান-১,২০,০০০ কর্মচারী-৫০,০০০
৩। চিংড়ি পোনা সংগ্রহ	-	-	২,০০,০০০
৪। প্রকৃত চিংড়ি ফড়িয়া/ব্যবসায়ী			৩,৯০০
৫। পোনা আড়তদার/ব্যবসায়ী	৮৩০		১,৫০০
৬। চিংড়ি পাইকার/ফড়িয়া	৩০০০		৫,০০০
৭। চিংড়ি ডিপো মালিক	১৫০০		৪,৫০০
৮। চিংড়ি আড়তদার	২০০		১,০০০
৯। চিংড়ি প্রসেসিং প্লান্ট	১০০		১০,০০০
১০। এজেন্ট	৩৮		৫০০
১১। কন্ট্রাকটর	৫০		২০০
১২। চিংড়ি হ্যাচারী	৪৭		১,৫০০
১৩। হ্যাচারী এজেন্ট	৭০		৫২৫
১৪। ফড়িয়া ও ব্যবসায়ী	১০০০		১,৫০০
১৫। পরিবহণ	৩০০০		৫০,০০০
১৬। বরফ তৈরী মিল	৪০০		২,০০০
১৭। চিংড়ি ধরার সরঞ্জাম তৈরী কারক	৫০০		১,০০০
মোট			৬৫৩,১২৫

চিংড়ি রপ্তানী করে প্রতি বছর বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় না। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সময়ে বহিরাগত ঘের মালিকদের প্রভাবে স্থানীয় শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ঘেরে কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল। বর্তমানে স্থানীয় ঘের মালিকদের প্রত্যাবর্তনের পর চাষীর নিজস্ব শ্রম ছাড়াও অধিক সংখ্যায় স্থানীয় শ্রমিকের কর্মসংস্থান বাড়ছে। এমনকি আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চিংড়ি ঘেরে ধান রোপনের সময় চিংড়ি অঞ্চলের আশেপাসের এলাকা থেকে অনেক শ্রমিকের আগমন ঘটে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের প্রায় ৬ লক্ষ লোক চিংড়ি চাষের সাথে জড়িত। পরবর্তী পৃষ্টায় কর্মসংস্থানের একটি ছক প্রদান করা হল।

বাংলাদেশে চিংড়ি সম্পদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান উৎপানের অদুর ভবিষ্যতে চিংড়ি শিল্প বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন প্রয়োজন শুধু পরিকল্পনা মাফিক চাষাবাদ; আহরণ উত্তর পরিচর্যা, পরিবহণ ও প্রসেসিং।

বর্তমানে নানা প্রতিকুলতার কারনে চিংড়ি শিল্পের অবস্থা ভাল নয়। বর্তমান সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করে চাষীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। হোয়াইট স্পট, ব্যাক্টেরিয়াল/ ফাংগাল ডিজিজ, অতিবৃষ্টি, নদি/ ঘেরে পলি জমা ছাড়াও চিংড়ি চাষ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা না থাকা এর কারন। সম্ভাবনাময় চিংড়ি শিল্পের এই অবস্থা চিন্তা করে ATDP (Agro-based Industries and technology Development Project) বাংলাদেশে ২০০৩ সাল থেকে এবং পরবর্তিতে World FishCenter ২০০৬ সাল থেকে চিংড়ি চাষের উন্নয়নের উপর কাজ শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত জনপ্রিয় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রবর্তনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ নেয়। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন, বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে অধিক উৎপাদন এবং ঝুকি কম হলেও অধিক প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় যা অধিকাংশ চাষীর ক্ষেত্রেই বহন করার সামর্থ থাকে না। আবার সামর্থ থাকার পরও অবকাঠামোগত সমস্যার কারনে অনেকের পক্ষে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিতে কয়েক বারে পোনা মজুদ ও গোনে গোনে আহরন ছাড়া আর তেমন কোন কাজ থাকে না। এখানে মজুদ পোনা বেঁচে থাকার হার, ঘেরের পরিবেশ, পানির গুনাগুন এবং খাবার প্রয়োগ সম্পর্কেও কোন খোজ খবর রাখে না। এই অবস্থায় উৎপাদিত চিংড়ি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে।

ATDP এবং World FishCenter অধিক উৎপাদন এবং কম ঝুকির কথা বিবেচনা করে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে বাংলাদেশে তিন ধরনের চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটায়।

যেমন- (১) আবদ্ধ চাষ পদ্ধতি (Closed System Technology)
(২) পরিবর্তিত প্রচলিত পদ্ধতি (Modified Traditional Technology) এবং
(৩) ভাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Best Management Practice) ইত্যাদি

(১) আবদ্ধ চাষ পদ্ধতি (সিএসটি)ঃ এই পদ্ধতিতে পানিকে জীবানুমুক্ত করে রোগমুক্ত পোনা মজুদ করে নিয়মিত খাবার প্রদান এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে চাষ করা হয়।

(২) পরিবর্তিত প্রচলিত পদ্ধতি (এমটিটি)ঃ এই পদ্ধতিতে নার্সারীর পানি জীবানুমুক্ত করে, রোগ মুক্ত পোনা নার্সারীতে মজুদ করে, নার্সারীতে নিয়মিত খাবার প্রদান করা হয় এবং ১৫-২০ দিন পর ঘেরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থাপনা সহজ এবং খরচও তুলনামূলক ভাবে অনেক কম বিধায় চাষী ভাইদের কাছে অধিক জনপ্রিয়।

(৩) ভাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (বিএমপি)ঃ এই পদ্ধতিতে কেবল মাত্র ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির চেয়ে অধিক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতি বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে চিংড়ি চাষের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিটা চাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কতকগুলো ধাপ অনুসরন করতে হয়। এগুলো নিন্মরূপঃ

- পুকুর / ঘের প্রস্তুতি
- মজুদ পূর্ব সার ব্যবস্থাপনা

- মজুদ ব্যবস্থাপনা
- খাদ্য ও মজুদ পরবর্তী সার ব্যবস্থাপনা
- পানির গুনাগুন ব্যবস্থাপনা
- রোগ ব্যবস্থাপনা
- চিংড়ি আহরন ও আহরন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা
- বিপনণ / বাজারজাত করন

বাংলাদেশের চিংড়ি চাষের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এবং উজ্জল ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে WorldFish Center, চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা ও এর বিভিন্ন ধাপ সহজ উপায়ে চাষী ভাইদের বোঝানোর জন্য পুস্তক আকারে প্রকাশ করার উদ্দ্যোগ গ্রহন করেছে। বইটি চিংড়ি চাষী ভাই/ বোনদের চাষের ক্ষেত্রে তথা বাংলাদেশের সামগ্রিক চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে বলে আশা করছি।

আবদ্ধ, প্রচলিত এবং ভাল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রতিটার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধাপ গুলো বিষদভাবে নিন্মে আলোচনা করা হলো।

চিংড়ি চাষের সামাজিক ও পরিবেশগত দিক

বাংলাদেশে ভৌগলিকভাবে বাগদা চিংড়ির আবাসস্থল ৩০° পূর্ব থেকে ১৫৫° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ৩৫° উত্তর থেকে ৩৫° দক্ষিণ অক্ষ রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যার আয়তন প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। অতীতে প্রাকৃতিক উৎস হতে এসব অঞ্চলে চিংড়ি পাওয়া গেলেও বর্তমানে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আশির দশকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিংড়ির চাষ শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় ২.০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ হচেছ। যার মধ্যে প্রায় ৪২০০০ টি বাগদা চিংড়ির খামার যার আয়তন ১৭০০০০ হেক্টর এবং প্রায় ১২০০০টি গলদা খামার যার আয়তন প্রায় ৪০০০০ হেক্টর। চিংড়ি চাষের ক্রম বিকাশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরের কিছু ব্যক্তি উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ শুরু করেন যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুনাফা অর্জন করা। স্বার্থবাদী মহল পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা না করে অপরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষ শুরু করেন। যার ফলে কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক লোক চিংড়ি চাষের বিপক্ষে অপপ্রচার চালাতে থাকে। যার ফলে চিংড়ির চাষ কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব হয়নি তবে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

নব্বই এর দশক থেকে স্থানীয় জমির মালিকরা বহিরাগত চিংড়ি চাষীদেরকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে নিজেরা নিজেদের জমিতে চিংড়ি চাষ শুরু করেন। বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ ঘেরই স্থানীয় জমির মালিকদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং চিংড়ি চাষীরা স্থানীয় পরিবেশ ও সামাজিকগত দিক বিবেচনা করে চিংড়ি ও ধান চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেহেতু চিংড়ি ও ধান চাষের সুফল স্থানীয় চাষীরা পেতে শুরু করেছে। পূর্বে যেখানে একটিমাত্র ফসল (আমন ধান) হত এবং অধিকাংশ সময় জমি অনাবাদী থাকত, বর্তমানে বছরের অধিকাংশ সময় চিংড়ি ও ধান চাষ হচেছ। পর্যায়ক্রমিক ধান ও চিংড়ি চাষের ফলে জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক ও বসতবাড়ীর অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক মর্যদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে একদা অবহেলিত জনগণ আজ অর্থনৈতিকভাবে বেশী অগ্রগামী। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জরিপ থেকে দেখা যায় যে, চিংড়ি চাষের পূর্বে অত্র এলাকার অধিকাংশ জনগণ ছিল খুবই দরিদ্র। তিন বেলা খাবারের জোগান করতে পারেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে নৌকা ও পায়ে হাঁটা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প মাধ্যম ছিল না। কিন্তু চিংড়ি চাষের ফলে দেখা যায় চিংড়ি চাষ এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। চিংড়ি চাষের প্রসারের ফলে এলাকার লোকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন-চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি আনুপাতিক হারে অন্যান্য এলাকা থেকে অনেক কম। আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে এলাকায় শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং অধিকাংশ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত জীবন-যাপনের জন্য শহরমূখী হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ফলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে এরং বিনোদনের দিকেও ঝুকে পড়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকজন নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ ভুলে গিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। অন্যদিকে চিংড়ি চাষের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার ফলে চিংড়ির সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে পৌছে গেছে।

চিংড়ি চাষের ফলে সামাজিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে পরিবেশেরও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চিংড়ির পোনা নদী থেকে আহরণ হলেও বর্তমানে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে পোনা ধরা বন্ধ হওয়ায় ও হ্যাচারী থেকে পোনা যোগান দেয়ার কারনে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ ছাড়া অপরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষের ফলে অসর্তকতার কারনে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু গাছপালা মারা গেলেও বর্তমানে পরিবেশ সহনশীল নতুন গাছপালা এই এলাকায় ব্যাপকভাবে রোপন করা হচ্ছে। বর্তমানে অনেক চিংড়ি ঘের/খামারের পার্শ্বে শাকসবজি, তরিতরকারির চাষ হচ্ছে। এ ছাড়াও বেসরকারী সংস্থার সহযোগীতায় স্থানীয় গরীব জনগণ আভ্যন্তরীণ রাস্তার দু'পাশ দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগাচ্ছে। যদি পরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষ করা হয় যেমন-বসত ভিটা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে চিংড়ি খামার করা হয় তাহলে গাছপালা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। পূর্বে এলাকার প্রতিটি পরিবারে গবাদী পশু ছিল কিন্তু বর্তমানে কিছুটা কমে গেছে এর কারণ হলো গবাদী পশুর খাদ্য ও বিচরণ ভূমির অভাব।এটা সত্য যে, চিংড়ি চাষ এলাকায় সারা বছর জমিতে প্রায়শঃ চিংড়ি থাকে বিধায় গবাদী পশু পালনের সুযোগ কম। তবে শুধু চিংড়ি এলাকায় নয় সারা দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূমির ব্যবহার বেড়ে গিয়ে গবাদী পশুসহ অন্যান্য পশুপাখির পালনের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। তাই বর্তমানে প্রায় সকল জেলাতেই উন্নত প্রযুক্তিতে খাবার দিয়ে খামারে গবাদী পশু পালন করা হচেছ। চিংড়ি এলাকায়ও খামারে গবাদী পশু পালন করতে দেখা যায়। সর্বোপরি একথা বলা যায় যে বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজনকে মূখ্য মনে করে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে চিংড়ি চাষ করা হলে বৈদেমিক মূদ্রা আয়ের পাশাপাশি সামাজিক ও পরিবেশগত দিক দিয়ে সবাই উপকৃত হবে।

কিছু কিছু পরিবেশবাদী সংগঠন চিংড়ি চাষের ফলে সামাজিক ও পরিবেশগত কিছু খারাপ প্রভাব পড়েছে বলে দাবী করেছেন যা নিম্নরূপঃ

- বনাঞ্চলের গাছপালা কমে গিয়েছে;
- চিংড়ির পোনা আহরণের ফলে স্থানীয় নদ-নদীতে প্রাকৃতিক উৎসের বহু প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে;
- অপরিকল্পিতভাবে ঘের করার ফলে আশে-পাশের ফসল ও গাছপালা বিনষ্ট হচ্ছে;
- জমির উর্বরতা হ্রাস পাচেছ;
- গবাদি পশু প্রতিপালনের সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে;
- জ্বালানী সংকট দেখা দিচ্ছে;
- জৈব সারের সহজলভ্যতা কমে যাচ্ছে;
- প্রাকৃতিক পরিবেশের জীব-বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে;
- দারিদ্র জনগোষ্ঠীর পেশা পরিবর্তন হচ্ছে;

উপরোল্লিখিত বিষযগুলো চিংড়ি বিশেষজ্ঞগন বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যা আদৌ সত্য নয়। চিংড়ি বিশেষজ্ঞদের অভিমত পরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষ করা অত্যাবশ্যক এবং সেজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করে পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা করতে হবেঃ

- চিংড়ি চাষের এলাকা ঘোষণা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ করতে হবে এবং উপযুক্ত স্থান সরকারীভাবে নির্বাচন করতে হবে;
- পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চিংড়ি চাষ অব্যাহত রাখতে হবে। এলাকায় লবণ সহনীয় উদ্ভিদ লাগাতে হবে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে লবণসহনীয় ধানের চষ করতে হবে।
- চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশলের উন্নয়ন করতে হবে;
- উৎপাদিত চিংড়ির গুনগত মানের উন্নয়ন করতে হবে;
- ক্ষতিকার ও অনঅনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে;
- জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- পানি নিষ্কাশন ও প্রবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে;
- অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে;
- পরিকল্পিতভাবে পশু সম্পদের উন্নয়ন করতে হবে;
- ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের দল গঠনের মাধ্যমে চিংড়ি খামারে সম্পৃক্ত করতে হবে;
- চিংড়ি চাষের সকল ক্ষেত্রে/সকল স্তরে সংগঠন থাকতে হবে;
- চিংড়ি চাষ নীতিমালা (Policy) ও আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন করতে হবে।

যেহেতু চিংড়ি আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে সেহেতু সামাজিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত হবে।

পুকুর / ঘের প্রস্তুতকরণ (Pond or Gher Preparation)

ভূমিকাঃ

ভাল কৃষি উৎপাদন পাওয়ার জন্য যেমন জমি পরিষ্কার, চাষাবাদ, বিভিন্ন সার ব্যবহার এবং পরিচর্যা গ্রহণ করতে হয় তেমনি ভাল চিংড়ি আহরণের জন্য পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর/ ঘের এবং নার্সারী যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হয়। পুকুরের পরিবেশ চিংড়ির বসবাসের উপযোগী রাখার জন্য সঠিকভাবে পুকুর প্রস্তুত করতে হয়।
অন্যদিকে চিংড়ির চাষ পদ্ধতির জন্য ঘেরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নার্সারী। চাষ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে নার্সারীর ধরন ও আকার ভিন্ন হয়ে থাকে।

আবদ্ধ চাষ পদ্ধতি (Closed System Technology)

আবদ্ধ চাষ পদ্ধতিঃ

এই পদ্ধতিতে পুকুর/ ঘেরের পানিকে জীবানুমুক্ত করে জীবানুমুক্ত পোনা মজুদ করা হয়। একবার পোনা মজুদ করে একবারেই সমস্ত চিংড়ি আহরণ করা হয়। চাষ কালীন সময়ে কেবল মাত্র জীবানুমুক্ত/ শোধিত পানি যোগ করে পানির গভিরতা ঠিক রাখা হয়। বার বার পানির পরিবর্তনের সুযোগ না থাকায় এই পদ্ধতির চাষকে আবদ্ধ চাষ বলা হয়ে থাকে।

১. এই পদ্ধতিতে পুকুরের চারিদিকের বাঁধ জৈব-নিরাপদ উপায়ে তৈরী করা হয়।
২. পুকুরের সমস্ত পানি জীবানুমুক্ত করা হয়।
৩. পুকুরের চারিদিকে বাঁধের উপর দিয়ে সবুজ নেট দিয়ে বেড়া তৈরী করা হয়।
৪. সবুজ নেটের অস্থায়ী নার্সারী তৈরী করা হয়।
৫. পুকুরের পোনা মজুদের ঘনত্ব ৬/বর্গমিটার। তবে অবস্থা ানুযায়ী ঘনত্ব কম বেশি হতে পারে।
৬. এখানে রিজার্ভার (পানি ধারক) এর প্রয়োজন হয়।

আমরা এখানে দুই ধরনের চাষ পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ চাষ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবেঃ

(১) রূপান্তরিত সনাতন পদ্ধতি (Modified Traditional Technology)
(২) আবদ্ধ চাষ পদ্ধতি (Close System Technology)

নার্সারী প্রস্তুতকরণ

নার্সারী ঃ

এমন একটি স্থান যেখানে চিংড়ির পোনাকে নির্দেষ্ট সময়ের জন্য রেখে যথোপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে লালন পালন করা হয়।

নার্সারীর উদ্দেশ্যঃ

১। রোগ/ভাইরাস প্রতিরোধ
২। পরিবেশের ভাল অবস্থায় রাখা

১. প্রয়োগকৃত খাদ্যের সুষম বন্টন
২. খাদ্য খেতে সুবিধা পায়
৩. প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য থাকে
৪. বাঁচার হার বৃদ্ধি পায়
৫. অবাঞ্ছিত প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পায়

CST এর নার্সারী তৈরীর দিকনির্দেশনাঃ

১. পুকুরের ভেতর উপযুক্ত স্থানে নেট দিয়ে অস্থায়ী নার্সারী তৈরী করা হয়।
২. সবুজ নেটের তলদেশ মাটির সাথে শক্তভাবে স্থাপন করা হয় যেন সহজে উঠে না যায়।
৩. এখানে পোনার ঘনত্ব ৫০-১০০/বর্গমিটার।
৪. এভাবে ১৫-২০ দিন রাখার পর নেট উঠিয়ে ফেলা হয়।

নার্সারীর আকারঃ

নার্সারীর আকার নির্ভর করে-

ক) পুকুরের পোনা মজুদের পরিমানের উপর
খ) নার্সারীতে কতদিন লালন পালন করা হবে

নার্সারীর জন্য করণীয় বিষয়ঃ

১। আনুবীক্ষণিক বাগান তৈরী
২। প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন সমৃদ্ধ করা
ক) সার প্রয়োগের মাধ্যমে
খ) সাবস্ট্রেট ব্যবহার করে

নতুন পুকুর তৈরী

১। বাঁধ নির্মাণ
২। পুকুর গভীর করা
৩। রিজার্ভর/পানি ধারক নির্মাণ

ক. বাঁধ নির্মাণঃ ভাইরাস প্রতিরোধে বাঁধে লিকেজ বা সিপেজ বন্ধ করা আবশ্যক। যদিও বাংলাদেশে বাঁধ নির্মাণে আনুপাতিক হারে খরচ অনেক বেশি, তথাপি যথাযথভাবে বাঁধ তৈরী সফল চিংড়ি চাষের পথকে সুগম করে। এজন্য সিল করে বাঁধ তৈরী করার গুরুত্ব অনেক বেশি।

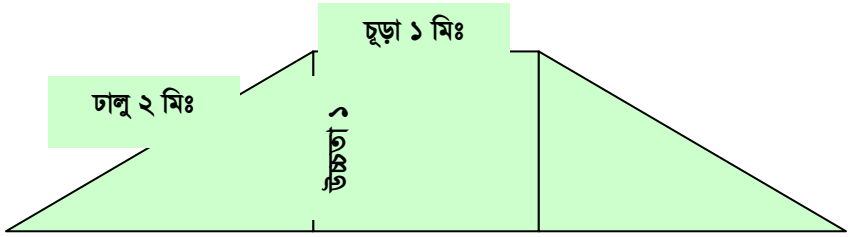

বাঁধ তৈরীর দিকনির্দেশনাঃ

(১) বাঁধের উচ্চতা ১ মিটার, চূড়া ১ মিটার এবং ঢালু হবে ২ঃ১।
(২) মাটিতে কমপক্ষে ২০ শতাংশ কাদা থাকলে ভাল বাঁধ তৈরী করা সম্ভব। যদি ১০ শতাংশের কম কাদা থাকে তাহলে কমপ্যাক্ট (মজবুত) হবে না। এছাড়া লিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে কাদার পরিমান বেশি হলে বাঁধে ফাটল সৃষ্টি হয়।
(৩) বেলে মাটি হলে বাঁধ অনেক বেশি প্রসস্থ করতে হবে এবং ঢালু অনেক বেশি রাখা হয়।
(৪) বাঁধ নির্মাণের জায়গা হতে ঘাস, গাছপালা, আগাছা এমনকি শুকনা তন্তুজাতীয় শেওলাও অপসারণ করতে হয়।
(৫) নতুন বাঁধ এবং মূল ভূমির মধ্যে বন্ধন ভাল হওয়ার জন্য মূল ভূমি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

(৬) নির্মানাধীন বাঁধের মূল ভমি অন্ততপক্ষে ১ ফুট কোর/খাল খনন করতে হবে এবং পরবর্তীতে দরমুজ দিয়ে স্তরে স্তরে কমপ্যাক্ট করে কোর ভরাট করা হয়।

(৭) ভাল কমপ্যাক্ট করার জন্য স্তরে স্তরে মাটি দিয়ে বাঁধ তৈরি করা হয়। প্রতিটি স্তরের উচ্চতা হয় ৬ ইঞ্চি হতে ১ ফুট পর্যন্ত। তাহলে ভার কমপ্যাক্ট সম্ভব হবে।

(৮) বাঁধে ব্যবহৃত মাটিতে পানির পরিমান গুরুত্বপূর্ণ। কাদাযুক্ত মাটিতে ১৫ শতাংশ পানি থাকলে বাঁধ নির্মাণের জন্য ভাল। মাটি যদি বেশি নরম হয় তাহলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো হয়-

- কম্প্যাক্ট সম্ভব হয় না।
- বাঁধে ফাটল সৃষ্টি হয়।
- বাঁধ নীচের দিকে নেমে যায়

অন্যদিকে মাটিতে পানির পরিমান কম বা মাটি শক্ত হলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো হয়-

- এক স্তরের সাথে অন্য স্তরের বন্ধন ভাল হয় না।
- মাটি খনন করতে সমস্যা হয়।

(৯) নতুন বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পুরাতন বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ। কারণ-

- পুরাতন ও নতুন বাঁধের সংযোগ ভাল হয় না।
- পুরাতন বাঁধে অসংখ্য লিক থাকে।

বাঁধ কমপ্যাক্ট করার পদ্ধতিঃ

(১) পাওয়ার ট্রিলার ব্যবহার করে।
(২) দরমুজ ব্যবহার করে।

খ. গভীরতা বজায় রাখাঃ

পুকুর এমনভাবে খনন করা উচিৎ যেন ৩ থেকে ৩.৫ ফুট পানি থাকে। গভীরতা বেশি হলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায়-

১) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে
২) ডুবন্ত উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণে থাকে
৩) প্রার্কতিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে
৪) পানির গুনাগুন পরিমাপকসমূহ হঠাৎ পরিবর্তিত হয় না।

গ. পানি ধারকঃ

বাইরের পানি সরাসরি চাষকৃত চিংড়ি পুকুরে প্রবেশ করানো নিরাপদ নয়। ঘোলা থাকা সত্ত্বেও এ পানিতে নানারকম সংক্রামক জীবাণু যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং অনেক অবাঞ্ছিত মাছ থাকে য চিংড়ি চাষের জন্য হুমকিস্বরূপ। এজন্য বাইরের পানি এখানে স্বল্প সময় রেখে ব্লিচিং দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে প্রয়োজন অনুযায়ী চিংড়ি পুকুরে ব্যবহার করা হয়।

<table>
<tr><td rowspan="2">$R\ 1/3$</td><td>$G\ 1/3$</td></tr>
<tr><td>$G\ 1/3$</td></tr>
</table>

পুরাতন পুকুর প্রস্তুতকরনঃ

পুকুরের তলদেশ পরিস্কার করা পুকুর প্রস্তুতির একটি গুরূত্বপূর্ণ কাজ। রোগমুক্ত পুকুরে রোগ হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশি। ব্যবহৃত পুকুরে বিশেষ করে যে পুকুরে মজুদ ঘনত্ব বেশি থাকে তার মাটির গুনাগুন খানিকটা নষ্ট হয়ে যায়। পুরাতন পুকুরের ভাল ব্যবস্থপনার জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হয়-

১. তলদেশে জমা হওয়া কাল Sludge সরিয়ে ফেলা
২. চাষ দেওয়া
৩. পুকুর শুকানো
৪. চুন ব্যবহার করা

নতুন ও পুরাতন পুকুরের জন্য করণীয়ঃ

১। পুকুরে পানি প্রবেশঃ

১) পরিস্কার এবং দূষণমুক্ত উৎস থেকে পানি গ্রহন
২) সম্ভব হলে নদী বা খাল থেকে পানি গ্রহন
৩) সূক্ষ্ম নেটের মধ্য দিয়ে ছাকনের মাধ্যমে পানি গ্রহন

পুকুরে পানি প্রবেশের পর অন্ততপক্ষে তিন দিন রাখা হয়। কারণ-

১) বাঁধে কোন ফাটল সৃষ্টি হলে পানি শোষনের পর তা বন্ধ হয়ে যায় এবং পানির ধারনক্ষমতা স্থায়ী হয়।
২) সাসপেনডেড (ঝুলন্ত) উপাদান ধীরে ধীরে পানির তলদেশে জমা হয়।
৩) পানির সাথে আগত ডিম হ্যাচিং এর সুযোগ পায়।

২। পানি জীবাণুমুক্ত করনঃ

যে কোন জীবিত জীব ভাইরাসের বাহক আর ভাইরাস চিংড়ি চায়ের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। পানিতে বিদ্যমান সকল জীবকে ধ্বংস করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। ব্লিচিং পাউডারকে পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরের সমস্ত পানিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে ক্লোরিন যৌগ ধীরে ধীরে ভাঙ্গে এবং পি,এইচ কম থাকলে ব্লিচিং পাউডারের কার্যকারিতা বেশি হয় বলে রাত ১০-১১ টার দিকে ব্লিচিং প্রয়োগ করা ভাল।

পরিমাণঃ

ব্লিচিং এর মাত্রা ৭০ ppm হারে প্রয়োগ করতে হবে। তবে ব্লিচিং এর পরিমান নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেঃ

- ব্লিচিং পাউডারে ক্লোরিনের শতকরা উপস্থিতির উপর
- পানিতে উপস্থিত প্রাণীর ক্লোরিন সহনীয়তা এবং পরিমানের উপর।
- p^H এর উপর; কম p^H হলে ব্লিচিং পাউডার বেশি কার্যকরী হয়।

ব্লিচিং এর পরিবর্তেঃ

- ডিপটারেক্স ১.৫ ppm হারে এবং রোটেনন ২ ppm হারে ব্যবহারযোগ্য।
- পানি ফিল্টার করে।

৩। মাইক্রোস্কপিক/আনুবিক্ষণিক বাগান তৈরীঃ

ব্লিচিং করার পর পুকুরের পানি প্রায় সুইমিংপুলের পানির মত হয়। অর্থাৎ পানিতে কোন প্রাকৃতিক খাবার থাকে না বললেই চলে। পোনা মজুদের পূর্বে এই পরিবেশকে পরিবর্তন করে উপকারি ব্যাকটেরিয়া, অ্যালার্জি, পেরিফাইটন এবং প্লাংকটনে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়। যে কারণে পোনার বাঁচার হার বৃদ্ধি, কম চাপ এবং পানির গুনাগুনের পরিমাপকসমূহ সাম্যাবস্থায় থাকে। ফলে চিংড়ি চাষের সফলতা বৃদ্ধি পায়।

নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পোনার জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভবঃ

- ✓ পাটের বস্তার এক মুখ খুলে বাঁশের ফ্রেমের সাথে বেঁধে ৪৫° কোণে মাটিতে স্থাপন।
- ✓ তালপাতা, গোলপাতা, নারিকেলপাতা ইত্যাদি নির্দিষ্ট দূরত্বে পানিতে স্থাপন।
- ✓ কঞ্চির আটি হালকা করে বেঁধে পানির ভেতর স্থাপন।
- ✓ এ সকল উপাদানে তলদেশীয় অ্যালজি, ব্যাকটেরিয়া, জুপ্লাংকটন এবং পেরিফাইটোন ইত্যাদি জমা হয় যা পোনা, জুভেনাইল এবং বড় চিংড়ি খাবার হিসেবে গৃহণ করে।

৪। সার প্রয়োগঃ

চিংড়ি চাষের জন্য সার প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সার হতে পেয়ে থাকে। এ সকল খাদ্য যেমন- ফাইটোপ্লাংকটন, জুপ্লাংকটন, বেনথোস ইত্যাদি চিংড়ি খাবার হিসেবে খায়। যা চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধি, বাঁচার হার বৃদ্ধি এবং চিংড়ির উৎপাদন বেশি হয়। ব্লিচিং প্রয়োগের ৬/৭ দিন পর নার্সারীতে এবং একই সময়ে চিংড়ি উৎপাদন এলাকায় সার প্রয়োগ করা হয়।

- সরিষার খৈল ১৫-২০ কেজি/হেক্টর।
- শুকনা গবর ১০০ কেজি/হেক্টর।
- চিটাগুড় (মোলাসেস) ৫০ কেজি/হেক্টর প্রথম বার এবং ২০ কেজি/হেক্টর পরবর্তীতে।
- অটোপালিশ ২০০ কেজি/হেক্টর প্রথম বার এবং ১০ কেজি/ হেক্টর পরবর্তীতে।

সার প্রয়োগে কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ

- নতুন পুকুর অপেক্ষা পুরাতন পুকুরে কম পরিমাণে সার প্রয়োজন হয়।
- ঋতু, আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থান এর সাথে সার ব্যবহার সম্পর্কিত।
- প্রাকৃতিক খাবার সমৃদ্ধ পুকুরে সার ব্যবহার দরকার হয় না।
- সার ব্যবহারের পরিমাণ এবং সময় পরিবর্তনশীল এবং এটা নির্ভর করে পুকুরে চিংড়ির পরিমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং উর্বরতার উপর।

৫। চিটাগুড় ব্যবহারের মাধ্যমে উপকারী ব্যকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

চিটাগুড় জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা প্রধানত সুক্রোজ। ব্যাকটেরিয়া চিটাগুড়কে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে এবং CO_2 তৈরী করে। এই CO_2 ফাইটোপ্লাংকটন ব্যবহার করে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন ত্বরান্বিত করে।

উপকারিতাঃ

- পুকুরের পানি এবং মাটিতে মাইক্রোঅর্গানিজমের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কার্যকরী করে।
- জীব বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়।
- উপকারী ব্যাকটেরিয়ার জন্য জৈব উপাদান যেমন- ভিটামিন, অ্যামাইনো এসিড, এনজাইম ইত্যাদি সমৃদ্ধ হয়।
- পুকুরে CO_2, অক্সিজেন এবং p^H এর সাম্যাবস্থায় রাখে।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ

একটি পাত্রে চিটাগুড়, অটোকুড়া এবং ইস্ট পরিমাণ মত পানির সাথে মিশিয়ে সারারাত রেখে দেওয়া হয়। সকাল ৯/১০ টার দিকে বেশি পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। সূর্যোজ্জ্বল দিনে চিটাগুড়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

সংক্রামক **(Contamination)** রোধে করনীয়ঃ

- ভাইরাসের কোন বাহক যেমন- কাঁকড়া, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি যাতে না আসতে পারে তার জন্য পুকুরের চারপাশে এমনকি আভ্যন্তরিণ বাঁধের উপরও ঘন জালের বেড়া দিতে হবে। এবং জাল বাঁধের বাইরের পাশ দিয়ে বসাতে হবে যেন ভাইরাসমুক্ত পরিবেশে হাটা চলা করা যায়।
- বাহক যেমন- পাখি প্রতিরোধের জন্য খুঁটির মাথায় রশি বেঁধে অথবা রঙিন কাগজ চাষকৃত এলাকার চারপাশে ব্যবহার করতে হবে।
- গরু বা ছাগল প্রতিরোধের জন্য বেড়া ব্যবহার করা।
- পানি সংক্রামন রোধের জন্য লিকমুক্ত অথবা সিপেজ মুক্ত বাঁধ নির্মাণ এবং পানির উচ্চতা বাইরের চেয়ে বেশি রাখা।
- ভিজিটর বা অন্যদের ব্লিচিং পানিতে হাত পা ধুয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া।
- ফার্মে ব্যবহৃত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- পাম্প, পাইপ, জাল, বালতি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে। এবং চিংড়ি আহরণ না হওয়া পর্যন্ত ফার্মেই রাখতে হবে।
- ফার্মে ব্যবহৃত খাবার এবং সার কোন ক্রমেই যেন সংক্রমিত না হয় তা নিশ্চিত করা।

উপসংহারঃ

বর্তমানে চিংড়ি চাষের অন্যতম সমস্যা ভাইরাস আর ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য সঠিক উপায়ে নার্সারী এবং পুকুর তৈরী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তাছাড়া মাটি ও পানির গুনাগুন তথা চিংড়ির পরিবেশকে অনুকুলে রাখার জন্য ভাল নার্সারী এবং পুকুরের গুরুত্ব অপরিসীম। রুগ্ন চিংড়ি শিল্পকে বাঁচাতে উপরোক্ত উপায়ে নার্সারী এবং পুকুর প্রস্তুত করে এই শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচন হবে বলে প্রত্যাশা করি।

মজুদ পূর্ব সার ব্যবস্থাপনা (Pre-Stocking Fertilization)

পোনা মজুদের পূর্বে সার প্রয়োগঃ

CST পদ্ধতিতে পানিতে ব্লিচিং করার কারনে পানি Sterile অবস্থায় থাকে বা পানিতে কোন ফাইটোপ্লাংকটন বা জুপ্লাংকটন থাকে না, পোনা মজুদের পর তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক খাবার অত্যাবশ্যকীয় বলে পানিতে প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদন করা জরুরী।

ব্লিচিং করার তিনদিন পর নার্সারীর পানিতে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়-

- পাটের বস্তার দুই মূখ খোলা হয় অত:পর বাঁশের বা কুঞ্চির ফ্রেমের মাধ্যামে পানিতে উল্লম্ব বা আনুভূমিক ভাবে স্থাপন করা হয়
- শুকনা তালপাতা, নারকেল পাতা অথবা গোলপাতা পানিতে স্থপন করা হয়।
- ৫-৬ টি বা ৮-১০ টি কুঞ্চি হালকা ভাবে বেঁধে পানিতে স্থাপন করা হয়।

উদ্দেশ্যঃ

পানিতে কয়েকদিন থাকার কারনে এ সমস্ত অবকাঠামোর উপর একধরনের slime আবরন তৈরী হয় যাহা ব্যাকটেরিয়া, এ্যালজি এবং পেরিফাইটোন দ্বারা তৈরী।

নার্সারীতে সার প্রয়োগঃ

নার্সারীর পানি শোধনের ৩-৪ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হবে। নার্সারীতে সার প্রয়োগের শতাংশ প্রতি পরিমান বা ডোজ হলো নিম্নরূপ-

উপাদান	পরিমান/ডোজ (প্রতি শতাংশ)		প্রয়োগ পদ্ধতি
চিটাগুঁড়	১ম বার	২য় বার থেকে পরবর্তী	চিটাগুড়, অটোপলিশ এবং ইষ্ট আগের দিন একত্রে মিশিয়ে দ্বিগুন পরিমান পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে পানিতে ছিটিয়ে দিন।
	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	
অটোপলিশ	১০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	
ইষ্ট	১ চা চামচ	আধা চা চামচ	

৪-৫ দিন অন্তর অন্তর সার ব্যবহার করুন। পানিতে প্রত্যাশিত রং (হালকা সবুজ, বাদামী সবুজ ইত্যাদি) না আসা পর্যন্ত ডোজটি অব্যাহত রাখুন। এ সকল সার ব্যতীত নার্সারীতে অন্য কোন সার ব্যবহার না করাই ভালো।

নিম্ন লিখিত ছকে উল্লেখিত সার বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়।

উপাদান	বিঘা প্রতি পরিমান (কেজি)	
ইউরিয়া	২	বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়
টি,এস,পি	৩	

পানিতে ব্লিচিং করার ফলে পানির স্বাভাবিক রং ফিরে আসতে কখনও কখনও বেশি সময় লেগে যায়। আর বেশি সময় পানি স্বচ্ছ থাকলে ঘেরে দ্রুত আগাছা ও নানা প্রকারের শ্যাওলা জন্মায় যা চিংড়ির স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়। এই সমস্যা সমাধানে ইউরিয়া ও টিএসপি ব্যবহার করলে দ্রুত পানির স্বাভাবিক রং ফিরে আসে। সাবধান থাকতে হবে যাতে পানির রং বেশি সবুজ হয়ে না যায়। পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হয়ে গেলে চিংড়ির পোনা মারা যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। পোনা মজুদের ১/২ দিন আগে অথবা পরে নার্সারীতে ইউরিয়া অথবা টি.এস.পি ব্যবহার করা যাবে না।

উপসংহারঃ

CST পদ্ধতিতে ১ম দিন থেকে খাবার প্রদান করা হলেও প্রাকৃতিক খাবার চিংড়ির পোনা বেশি পছন্দ করে এবং বেচে থাকার হার বৃদ্ধি করে। সার ব্যবহারের কারনে একদিকে প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অন্য দিকে পুকুরের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রাকৃতিক খাবার পোনার বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার হারকে ত্বরান্বিত করে। মজুদপূর্ব সার ব্যবস্থাপনা ফাইটোপ্লাংকটন এবং জুপ্লাংনের প্রাচুর্যতা বাড়ায়। এজন্য মজুদপূর্ব সার ব্যবস্থাপনা গুরুত্বেও সাথে বিবেচনা করা উচিত।

চিংড়ি পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা
(Shrimp PL Stocking Management)

ভূমিকাঃ

চিংড়ি চাষের বিভিন্ন ধাপগুলোর মধ্যে পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মজুদ ব্যবস্থাপনার নিপুণতার উপর নির্ভর করছে মজুদোত্তর জীবিতের হার যা বার্ষিক উৎপাদনকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। পাশাপাশি এই কার্যক্রমটি যত্নসহকারে ও সঠিকভাবে সম্পাদনে ব্যর্থ হলে ঘেরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে ছোট চিংড়ি মরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, সর্বোপরি বছর শেষে পুঁজি ফিরে না আসার ঘটনা ঘটে। চিংড়ি চাষ বাংলাদেশে অত্যন্ত লাভজনক একটি খাত। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হলে অন্যান্য যেকোন কৃষিজ খাতের তুলনায় বহুলাংশেই লাভজনক হলেও খাতটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সমস্যাবহুল যা চিহ্নিত ও মোকাবেলা করার উদ্যোগ নেয়া অতীব জরুরী। কারিগরী দৃষ্টিকোণ বিবেচনায়, মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় চাষিরা ঘেরে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোনা মজুদের সময় কোনো ধরণের নিয়মকানুন মানে না। কেউবা হয়তো আংশিক মানেন যার ফলশ্রুতিতে চাষির উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আলোচ্য বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝার সুবিধার্থে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভজিত করা যায়। যেমন-

(১) মজুদপূর্ব করণীয় বা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা (Pre stocking Management)
(২) মজুদকালীন করণীয় বা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা (Stocking Management)
(৩) মজুদোত্তর করণীয় বা মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা (Post stocking Management)

অর্থাৎ সহজভাবে বললে, পোনা মজুদের আগে কি কি করতে হবে, মজুদের দিন/সময় কি কি করতে হবে এবং মজুদ করার পরপর কি কি করতে হবে তা নির্ধারণ করা।

মজুদপূর্ব করণীয় বা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা ঃ

এপর্যায়টি হলো পোনা মজুদের তারিখ নির্ধারণের পর থেকে পোনা মজুদের আগের সময়টুকু যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে এই পর্বের করণীয়গুলো নিম্নরূপ-

- নার্সারীর বায়ো-সিকিউরিটি বা জীব-নিরাপত্তা নিরীক্ষণ ও প্রয়োজনে মেরামত করা।
- নার্সারীর পানির ঘোলাত্ব, রং বা অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক প্রয়োজনে সার বা চিটাগুড়ের ডোজ ব্যবহার করা।
- নার্সারীতে মাইক্রোস্কোপিক গার্ডেন পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে উন্নয়ন।
- নার্সারীতে মাইক্রোস্কোপিক গার্ডেনে ব্যবহৃত শুকনো ডাল-পাতা জাতের উপাদানগুলোতে (Substrates) শেৎলা (শেওলা) অর্থাৎ পেরিফাইটন জন্মেছে কিনা দেখা। যাতে কোন ধরনের শিকারী পাখি বসতে না পারে সেজন্য উক্ত Substrates গুলো পানির উপরে ভেসে থাকলে তা ডুবিয়ে দিতে হবে ।
- ঘেরের পানির লবনাক্ততা, পি-এইচ, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপ করা।
- পোনার উৎসের সাথে যোগাযোগ করে পোনা মজুদের তারিখ, পৌঁছানোর সময়, মূল্য নির্ধারণ, পলিতে পোনার সংখ্যা ও স্যালাইনিটির পরিমান নিশ্চিত হওয়া।
- মূল ঘেরে এবং নার্সারীতে মোট কত সংখ্যক পোনা মজুদ করা হবে তার একটি হিসাব পূর্বে থেকেই করে নিতে হবে। পোনার মজুদ ঘনত্ব হিসাবের জন্য নিম্নের ছকটি অনুসরণ করা যেতে পারে -

চাষ পদ্ধতি	নার্সারী/ ঘের	মজুদ ঘনত্ব				
		প্রতি বর্গ মিটার	প্রতি শতকে	প্রতি বিঘায়	প্রতি হেক্টরে	বার্ষিক মজুদ সংখ্যা
সিএসটি (CST)	মূল ঘেরে অবমুক্তকরণ	৬	২৪০	৮০০০	৬০০০০	২ বার
	নার্সারী পুকুরে অবমুক্তকরণ	৩০	১২০০	৩৯৬০০	৩০০০০০	

মজুদকালীন করণীয় বা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ঃ

পোনা সংগ্রহের পর ঘেরের পানির সাথে অভ্যস্থকরণ এবং অবমুক্তকরণ পর্যন্ত পর্যায়টি খুবই স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ। যথেষ্ট সতর্কতার সাথে এই পর্বের কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়। যার কতিপয় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

- পোনার বাক্সগুলো অপেক্ষাকৃত অধিক ছায়াযুক্ত স্থানে রাখুন।
- প্রখর রোদের মধ্যে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পোনা মজুদ না করাই ভাল।
- পোনা ছাড়ার পূর্বে ঘেরের পানির তাপমাত্রা ও লবনাক্ততা পরীক্ষা করুন এবং পলির ভেতরের পানির সাথে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
- পানিতে নেমে হাত দিয়ে সজোরে পানি নেড়ে ওলট-পালট করে দিন। তাতে করে নীচের ঠাণ্ডা পানি উপরে আসবে এবং পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিক হবে।
- তারপর পলিগুলো মুখ আটকানো অবস্থায় পানিতে ভাসিয়ে দিন এবং উপর থেকে দু'হাত দিয়ে বৃষ্টির মতো করে অন্তত: ১০ মিনিট পানি ছিটাতে থাকুন।
- পলির মুখ খুলে ভাঁজ করুন এবং মুখ খোলা অবস্থায় উপর থেকে পলিগুলোর মুখে দু'হাত দিয়ে বৃষ্টির মতো করে অন্তত ৩০ মিনিট পানি ছিটাতে থাকুন। ধীরে ধীরে পলির ভেতরের ও বাইরের পানির অবস্থা (লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ইত্যাদি) সমপর্যায়ে চলে আসবে এবং পোনাগুলো নতুন পানির সাথে অভ্যস্থ হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধায় খুবই সতর্কতার সাথে এবং একটু বেশি সময় নিয়ে করা উচিৎ।
- পানি ছিটানোর ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি পলি পোনা ও পানি সহ দু'হাত দিয়ে কিছুটা উপরে উঠিয়ে পোনাগুলোর চলাচল দেখার চেষ্টা করুন। বেশিরভাগ পোনা পলির মাঝের ও উপরের স্তরে ভেসে বেড়াবে। পলির তলায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং মৃত পোনাগুলো জঁটলা পাকানো অবস্থায় থাকবে।
- উম্মুক্ত পলি কাত করে তার মধ্যে কৃত্রিম স্রোতধারা দিলে স্রোতের বিপরীত দিকে পোনা বেরিয়ে আসবে। নার্সারী পুকুর আয়তনে বড় অর্থাৎ মোটামুটি ১০ শতাংশের অধিক হলে কয়েটি স্থানে পোনা ছাড়ুন। চেষ্টা করুন পোনাগুলো আপনার অবস্থানের সামনে, ডানে, বায়ে ছাড়ার জন্য এবং শেষে পেছনের দিকে হেটে আসুন তাতে আপনার পায়ের নীচে পড়ে পোনা মরার আশংকা হ্রাস পাবে।

সুস্থ ও সবল পোনা চেনার উপায় ঃ

পিসিআর পরীক্ষিত পোনা বা বিশ্বস্থ হ্যাচারী থেকে ভাল পোনা মজুদ করা উচিত। কারণ বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে পোনার গুনগত মান সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা যায় না। মজুদের পূর্বে পোনার কিছু আচরণ/অবস্থা নিরীক্ষণ করুন। এই দেখার কাজে অনেকে আঁতসী কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে। নিম্নে সবল ও দুর্বল পোনার কিছু বৈশিষ্ট উপস্থাপন করা হলো-

সবল পোনা	দূর্বল পোনা
খোলসের রং উজ্জল, স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক	খোলসের রং অনুজ্জল, অস্বচ্ছ ও অস্বাভাবিক ঘোলাটে।
উপাংগসমূহ দৃঢ় এবং স্বাভাবিক	উপাংগসমূহ অস্বাভাবিক ভাংগা অসম্পূর্ণ
খাদ্যনালী পূর্ণ	খাদ্যনালী অপূর্ণ
স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটে	স্রোতের পক্ষে সাতার কাটে
বিরক্ত করলে দ্রুত লাফ দিয়ে সরে যায়	বিরক্ত করলেও দ্রুত সরে যায় না এবং খুবই দুর্বল চলাচল
পলির নীচে তলানীর মতো জমে থাকে না	পলির নীচে তলানীর মতো জমে থাকে।

মজুদোত্তর করণীয় বা মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা ঃ

নার্সারীতে পোনা মজুদের পর থেকে পরবর্তী ১-২ দিন এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত। পোনা ছাড়ার ঘন্টা দু'এক পরে খাবার প্রয়োগ করুন। খাবারের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি আলাদা অধিবেশন আছে। তদুপরি, সংক্ষেপে খাবার প্রয়োগের সুবিধার্থে ছোট সহজ একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

- প্রথম পাঁচদিন প্রতি এক হাজার পোনার জন্য ১৫ গ্রাম হিসেবে খাবার দিবেন।
- পরের পাঁচদিন প্রতি এক হাজার পোনার জন্য ২০ গ্রাম হিসেবে খাবার দিবেন।
- পরের পাঁচদিন প্রতি এক হাজার পোনার জন্য ২৫ গ্রাম হিসেবে খাবার দিবেন।

পোনা ছাড়ার প্রথম দু-চারদিন পোনা দেখা যাবে না। তার পর ভোরে পানির উপরে, পাড়ের কাছাকাছি স্থানে, লতানো ঘাস বা কোন সাবসট্রেটের গায়ে ছোট ছোট পোনা ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। সূর্য উঠার পরে আর দেখা যাবে না।

অভ্যস্থকরণের গুরুত্ব ঃ

তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পিএইচ প্রভৃতির স্বল্পতা ও আধিক্য চিংড়ির মধ্যে পীড়ন সৃষ্টি করে যা রোগ সংক্রামণেনর কারণ/মৃত্যুর কারণ হতে পারে। হ্যাচারী বা নার্সারীর নিয়ন্ত্রিত একটি পরিবেশ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোনাগুলো নতুন পরিবেশে ছাড়া হয় যা সহনীয় হওয়া অতীব জরুরী। নতুন পরিবেশে খুবই প্রতিকূলতার সম্মুখিন হতে হয় বিধায় পোনাকে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। যাতে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে চাপমুক্তভাবে অভ্যস্থ হতে পারে। যথেষ্ট সতর্কতা ও সার্থকতার সাথে এই কাজটি সম্পাদনে সমর্থ হলে

- মজুদের সময় পোনা শারীরিকভাবে চাপের (Stress) সম্মুখীন হবে না। ফলে বেশীরভাগ পোনা সুস্থ থাকবে এবং মজুদকালীন মৃত্যুর হার কম হবে।
- জীবিতের হার বৃদ্ধি পাবে যা বছর শেষে উৎপাদনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- চাষীকে ঘন ঘন এবং বেশি বেশি করে পোনা মজুদ করতে হবে না, ফলশ্রুতিতে মজুদ খাতে বেশ কিছু টাকা খরচ করা থেকে রেহাই পাবে।

অভ্যস্থকরণের নিয়ামক সমূহ ঃ

পানিতে বিদ্যমান প্রায় সব কয়টা প্যারামিটারই পোনা মজুদের সময় ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে যেমন- তাপমাত্রা, স্যালাইনিটি, পি-এইচ, অ্যালকেলাইনিটি, দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদি। তার মধ্যে মাঠ পর্যায়ে পোনা ছাড়ার সময় যে ফ্যাক্টরগুলো অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় তাহলো- লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা । এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে বা জরুরী প্রয়োজনে চাষীরা হাত-মুখ দিয়েও এই দু'টি প্যারামিটারকে অনুভব করতে পারে। প্যারামিটারগুলোকে ম্যানুয়ালী বাড়ানো বা কমানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় নেয়া উচিৎ। যেমন-

- তাপমাত্রা বাড়ানো কমানোর মাত্রা প্রতি ঘন্টায় ১.৫ সে. এর বেশি হওয়া অনুচিত।
- লবণাক্ততা কমানোর মাত্রা প্রতি ঘন্টায় ৩ পিপিটি এবং বাড়ানোর মাত্রা প্রতি ঘন্টায় ১ পিপিটি এর বেশি হওয়া অনুচিত।
- পিএইচ পরিবর্তনের মাত্রা প্রতি ঘন্টায় ০.৫ এর বেশি হওয়া অনুচিত।

উপসংহার ঃ

চিংড়ি ঘেরের অন্যান্য কাজগুলোর মতো পোনা মজুদের কাজটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সে সাথে অধিকতর স্পর্শকাতর বিধায় কাজটি অসাবধানতা বা হালকাভাবে সম্পাদন করার কোন সুযোগ নেই। আর এক্ষেত্রে ভুল করা হলে অবশ্যই মজুদকালীন পোনা মৃত্যুর হার ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে যা বছর শেষে উৎপাদনকেও ব্যাহত করবে। সুতরাং ঘেরের সকল কাজের পাশাপাশি মজুদ ব্যাবস্থাপনার কাজটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদন করতে হবে যা চাষীর সফল ও লাভজনক উৎপাদনে সহায়ক হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা
খাদ্য এবং মজুদ পরবর্তী সার ব্যবস্থাপনা
(Feeding and Post Stocking Fertilizaiton)

দিবস ঃ ০২ সময় ঃ ১১:১৫-১২:৩০ মেয়াদ কাল ঃ ৭৫ মিঃ

অংশগ্রহণকারী ঃ এনজিও এর সম্প্রসারণ কর্মী এবং চাষের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ।

অধিবেশনের শিরোনাম ঃ খাদ্য এবং মজুদ পরবর্তী সার ব্যবস্থাপনা ।

লক্ষ্য ঃ অংশগ্রহণকারীদের সিএসটি পদ্ধতিতে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, পরিমান, খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি ছাড়াও মজুদ পরবর্তী সার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব, উপকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে শিখানো।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ CST পদ্ধতিতে ব্যবহৃত খাদ্যের মান প্রয়োজনীয়তা, পরিমান এবং মজুদ পরবর্তী সার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব, উপকারিতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারবে।

বিষয় সূচী	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ কৌশল	সময় (মিনিট)	উপকরণ
ভূমিকা	• ভূমিকা আলোচনা/ স্বাগত আলোচনা। • পূর্বের অধিবেশনের বিষয়বস্তুর পূনরালোচনা। • চলতি অধিবেশনের বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত।	বক্তৃতা	১০	
বিষয়বস্তু	• খাদ্য কি • খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলতে কি বুঝায় • খাদ্য প্রয়োগের নিয়মাবলী • খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ • খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ • চিংড়ি মাছের উৎপাদন ও উৎপাদন খরচের উপর খাদ্যের প্রভাব • খাদ্য রূপান্তরের হার, খাদ্য সংরক্ষন এবং খাদ্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন। • মজুদ পরবর্তী সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, নাম এবং উপকারিতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।	ফ্লিপচার্ট প্রদর্শণ, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	৫০	ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ইজেলবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার
সারসংক্ষেপ	• মূল বিষয়বস্তুর পূনরালোচনা/ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোধগম্যতা যাচাই। • হ্যান্ড আউট বিতরণ। • পরবর্তী সেসনের উপর আলোকপাত। • উপসংহার এবং ধন্যবাদ প্রদান ।	বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	১০	হ্যান্ড-আউট, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Feed Management)

বাগদা চিংড়ি মূলতঃ মাংসাশী তবে এর জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটায় তাই চিংড়িকে সর্বভূকও বলা যেতে পারে। নিশাচর এবং পানির তলদেশের প্রাণী। সূর্যের আলোকে এড়িয়ে সাধারণতঃ রাতেই খাবার খেতে পছন্দ করে। শ্যাওলা, জুপ-াংকটন, পোকা-মাকড়, ছোট চিংড়ি, ছোট শামুক-ঝিনুক এবং ছোট মাছ এদের পছন্দের খাদ্য। জুপাংকটনের মধ্যে প্রোটোজোয়া, রটিফার, ক্লাডোসেরা, কপিপোডা তাদের প্রিয় খাদ্য। এরা ব্লু গ্রীণ অ্যালগি (স্পাইরুলিনা, অছিলেটরিয়া, এ্যানাবিনা, নসটক), গ্রীণ অ্যালগি (ক্লোরেলা, ক্লাডোফোরা, ডেসমিডস, ওডাগোনিয়াম) এবং ডায়াটমস (নেভিকুলা, সাইক্লোটেলা, কিটোসেরাস) ইত্যাদি ফাইটোপ্লাংকটন খায়। এ ছাড়া নাজাস, পেরিফাইটন, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খায়। এজন্য চিংড়িকে সর্বভুক বলা হয়। চিংড়ি স্বজাতিভোজী। বয়স, ঋতু ও স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে খাদ্যও পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ ছোট অবস্থায় ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্লাংকটন এবং বড় অবস্থায় মাংস জাতীয় খাদ্য পছন্দ করে।

চিংড়ির পুষ্টির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। চিংড়ির পুষ্টি চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি, চলাচল দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্বাভাবিক রাখতে জরুরী প্রয়োজন। যে খাদ্য চিংড়ি সহজে খেতে পারে, হজম করতে পারে, পুষ্টি শরীরের বিভিন্ন অংশে (কোষ) পৌঁছে কোষের কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক রাখে এরূপ খাদ্যকে চিংড়ি খাদ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

খাদ্য ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবেশঃ

উপযুক্ত সুযোগসুবিধা বা পরিবেশে খাদ্য ব্যবহার না হলে তা উপকারের চেয়ে ক্ষতিকর। এছাড়া খাদ্য ব্যবহারের পূর্বে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

- পানির গুনাগুণ সঠিক মাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে
- পুকুরের তলদেশ দুষনমুক্ত ও পরিস্কার রাখতে হবে
- পানিতে আনুবীক্ষনিক জীবের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে
- অন্যান্য জলজ প্রাণী নিয়ন্ত্রিত হতে হবে
- যেখানে বাগদার চাষ হয় সেখানে বাগদার খাবার দিতে হবে
- খাদ্য ব্যবহারের লাভ-লোকসানের হিসাব করে নিতে হবে
- অসুস্থ চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে না
- বিবিন্ন বয়স ও আকারের চিংড়ির জন্য খাদ্য চাহিদা ও আকার ভিন্ন

খাদ্য কি?

যা খেলে শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ এবং শক্তি যোগায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাই খাদ্য। চিংড়ির পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে চিংড়ি নিজের ইচ্ছামত গ্রহণ করে থাকে। চাষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ অবস্থায় চিংড়িকে পুষ্টির জন্য খাদ্য যোগান বা তৈরি করে দিতে হবে। চিংড়ি সর্বভুক এ কথা স্মরণ রেখে তার খাদ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে। চাষের জন্য দুই প্রকার খাদ্য প্রয়োজন যেমন (ক) প্রাকৃতিক খাদ্য ও (খ) পরিপূরক বা সম্পূরক খাদ্য।

প্রাকৃতিক খাদ্যঃ

উপযুক্তভাবে তৈরী ও সার প্রয়োগকৃত পুকুরে ভাসমান শৈবাল (algae) তৈরী হয়। পাশাপাশি পানির গভীরতা কম থাকলে ফিলিপিনোদের ভাষায় ল্যাব ল্যাব (lablab), লুমুট (lumut) এবং দিগমান (Digman) ইত্যাদি তৈরী হয়। ল্যাব ল্যাব এক ধরনের আনুবীক্ষনিক তলদেশজাত উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সমষ্টি। ২৮ পিপিটি এর অধিক লবনাক্ততায় এরা জন্মে। এর পরিমাণ বেশী হলে তা পচে অ্যামোনিয়া (NH_3) ও হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) তৈরী করে এবং পুকুরের তলদেশে দূষণ সৃষ্টি করে। যে সকল পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করা হয় সেখানে এ জাতীয় উৎপাদন পরিহার করা হয়।

লুমুট এক ধরনের সুতো শেওলা (green filamentous algae) ও আনুবীক্ষণীক তলদেশজাত উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সমষ্টি। কম লবণাক্ততায় (৪ -১০ পি পি টি) খামারের তলদেশে জন্মায়। এজাতীয় শেওলা চিংড়ির চলাচলে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং ছোট চিংড়ির মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠে। এছাড়া পুকুরের তলদেশে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ (macrophytes) জন্মায়। এ সমস্ত উদ্ভিদের গায়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী, নরম ডালপালা ইত্যাদি বড় বাগদার খাদ্য। এজাতীয় উদ্ভিদ পানির গুণাগুণে প্রভাব ফেলে তাই এদের উপস্থিতি উপকারের চেয়ে অপকার বেশী ঘটায়।

ফাইটোপ্লাংকটন বা উদ্ভিদকনা পানিতে খাদ্য শিকলের প্রাথমিক উৎপাদন। এই খাদ্যর উপর নির্ভর করে জুপ্লাংকটন ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও প্রাচুর্য্যতা। পানিতে খাদ্য-শিকল বজায় রাখতে ফাইটোপ্লাংকটন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পানির রং থেকে এর উপস্থিতি বুঝা যায়। অধিক প্লাংকটন গ্যাস ও পদার্থের সৃষ্টি করে। প্লাংকটন পানিতে না থাকলে সে পানিতে চিংড়ি চাষ করা উচিৎ নয়। কারণ ফাইটো ও জুপপ্লাংকটনের উপর নির্ভর করে পানিতে/তলদেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী জন্মায় তা চিংড়ির উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্য।

পরিপূরক বা সম্পূরক খাদ্যঃ

পোনা মজুদের প্রথম অবস্থায় বা চাষের প্রথম পর্যায় প্রাকৃতিক খাদ্য পাওয়া গেলেও চিংড়ি বড় হবার সাথে সাথে বাহির থেকে সম্পূরক খাদ্যের চাহিদা দেখা যায়। চিংড়ির পুষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার দেয়া হলে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রদত্ত খাবারে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান বিদ্যমান আছে কি না এবং প্রদত্ত খাবার পানি দূষনের সৃষ্টি করে কি না।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায়?

সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে এবং খাবারের নিশ্চিত ব্যবহারের মাধ্যমে চিংড়ি মাছের সর্বোচ্চ উৎপাদনই হচ্ছে খাদ্য ব্যবস্থাপনা। চিংড়ি খামার পরিচালনার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খাদ্য এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা। চিংড়ি খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যয়বহুল খাত খাদ্য। তাই প্রতিবার খাদ্য ব্যবহারের সময় মাছের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ব্রডকাস্ট ফিডিং এর চেয়ে ট্রে-ফিডিং গুরুত্বপূর্ণ।

বাগদা চিংড়ি চাষের সফলতা নির্ভর করে যথোপযুক্ত খামার ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি এবং পরিবেশ সচেতনতার উপর। গুণগত মান সম্পন্ন খাবার সঠিক বিরতিতে এবং সঠিক পরিমাণে ভ্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে পানির গুণগত মান এবং ঘেরের তলার অবস্থা ভাল রাখবে যা ভাল উৎপাদন পেতে সহায়তা করবে। চিংড়ির খাবার দেওয়ার সময় আনুমানিক ১০ শতাংশ খাবার পানির সাথে মিশে যায় যা ব্যকটেরিয়া এবং ক্ষুদ্র শ্যওলার পুষ্টি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিমিত মাত্রায় খাবার ব্যবহার করলে চিংড়ি এবং অন্যান্য প্রাণীর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে। অতিমাত্রায় খাদ্য ব্যবহারে পানিতে পুষ্টির পরিমান বেড়ে যাবে এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে পুকুর ব্যবস্থাপনা কঠিন হবে এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চিংড়ি ধরে ফেলতে হতে পারে। ব্যবহৃত খাদ্যের গুণগত মান এবং খাদ্য উপাদান সম্পর্কে সঠিক ধারনা থাকা প্রয়োজন।

খাদ্যের মাত্রা নির্ধারণঃ

চাষ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে খাদ্যের মাত্র বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে-

(১) সংশোধিত প্রচলিত পদ্ধতি (Modified Traditional Technology)
(২) আবদ্ধ চাষ পদ্ধতি (Close System Technology)

(১) আবদ্ধ চাষ পদ্ধতিঃ

আবদ্ধ চাষ পদ্ধতিতে পুকুর /ঘেরের ভিতরেই উপযুক্ত স্থানে নেট দিয়ে নার্সারী তৈরী করা হয়। প্রকৃত অর্থে এই পদ্ধতিতে সমস্থ পুকুর/ঘেরকেই নার্সারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নেট নার্সারীর সুবিধা হচ্ছে-শুধু মাত্র নেট তুলে নিলেই পোনা সমস্ত ঘেওে ছড়িয়ে পড়ে, স্থানান্তও করার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে অল্প জায়গায় সকল পোনার জন্য খাবার নিশ্চিত করা যায় আবার খাবারের অপচয়ও কম হয়।

নার্সারীতে খাদ্য দেয়ার পরিমান ও সময় নিম্নলিখিত ছক অনুসাওে প্রদান করা হয়ে থাকে-

(প্রতি হাজার পোনার জন্য খাবার তালিকা)

দিন/তারিখ	সময় ও খাদ্যের শতকরা হার				মোট খাদ্য (গ্রাম)
	২০%	২০%	২৫%	৩৫%	
সময়	৬.৩০	১১.৩০	৪.৩০	৮.৩০	
প্রথম - পঞ্চম	৩	৩	৩.৭৫	৫.২৫	১৫
ষষ্ঠ - দশম	৪	৪	৫	৭	২০
একাদশ - পঞ্চদশ	৫	৫	৬.২৫	৮.৭৫	২০

বিঃদ্রঃ খাবার সম্পূর্ণ নার্সারীতে ছিটিয়ে দিতে হবে। নার্সারীতে ট্রে ব্যবহার করা যাবে না।

আবদ্ধ চাষ পদ্ধতিতে পালন পুকুরে দুইভাবে খাবার দেওয়া যেতে পারে।

ক) ছিটানো পদ্ধতিঃ

- এক্ষেত্রে খাবার পরীক্ষা করার জন্য চেক ট্রে ব্যবহার করা হয়।
- হেক্টর প্রতি ৬টি চেক ট্রে ব্যবহার করা হয়
- চেক ট্রে'র আয়তন ০.৬৪ বর্গমিটার।

প্রতিটি চেক ট্রে-তে খাবারের পরিমান নিম্নলিখিত সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়-

$$\text{চেক ট্রে-তে খাবারের পরিমাণ} = \frac{\text{চেক ট্রে-তে খাবারের শতকরা হার} \times \text{এক বেলা খাবারের পরিমান (গ্রাম)} \times ১৬০০}{\text{পুকুরের আয়তন} \times ১০০}$$

উদাহরণঃ

মাছের গড় ওজন = ৮ গ্রাম
চেক ট্রে-তে খাবারের শতকরা হার = ২.৬%
এক বেলা খাবারের পরিমান = ১৭৬৩ গ্রাম
পুকুরের আয়তন = ২৩০০ বঃ মিঃ

সুতরাং,

$$\text{চেক ট্রে-তে খাবারের পরিমাণ} = \frac{২.৬ \times ১৭৬৩ \times ১৬০০}{২৩০০ \times ১০০}$$

$$= ৩১.৮৯ \text{ গ্রাম}$$

নিম্নলিখিত সূত্র অনুসারে খাবারের % বের করা যেতে পারে-

$$\text{\% খাদ্য} = \frac{\text{এক দিনের খাবারের পরিমান}}{\text{সর্বমোট মাছের ওজন}} \times ১০০$$

চিংড়ি মাছের ওজনের সাথে খাবারের হার এবং চেক ট্রে-তে খাবারের হার নিচের ছকে দেখানো হল-

গড় ওজন (গ্রাম)	চেক ট্রে-তে খাবারের হার (%)	খাবারের হার (%)
৬-৭	২.৪	৫.৫-৫.৩
৭-৮	২.৬	৫.৩-৫.১
৮-৯	২.৬	৫.১-৪.৯
৯-১০	২.৮	৪.৯-৪.৭
১০-১২	৩.০	৪.৯-৪.৫
১২-১৪	৩.১	৪.৫-৪.২
১৪-১৬	৩.২	৪.২-৪.০
১৬-১৮	৩.৩	৪.০-৩.৭
১৮-২১	৩.৪	৩.৭-৩.৪
২১-২৪	৩.৬	৩.৪-৩.২
২৪-২৭	৩.৭	৩.২-৩.০
২৭-৩০	৩.৯	৩.০-২.৭

খাদ্যের পরিমান সঠিকভাবে নিরূপনের জন্য নিম্নলিকিত ছক অনুসরণ করতে হবে-

চেকের সময়	ট্রে-তে অবশিষ্ট খাদ্যের পরিমান	খাদ্য নিরূপণ
খাদ্য দেওয়ার দেড় ঘন্টা পর	না থাকলে	বাড়াতে হবে
খাদ্য দেওয়ার ২ ঘন্ট পর	না থাকলে	একই থাকবে
খাদ্য দেওয়ার ৩ ঘন্টা পর	না থাকলে	কমাতে হবে

৫০ দিন পর মাছের ওজন পরীক্ষার মাধ্যমে পরবর্তীতে মাছ ধরার পূর্ব পর্যন্ত চেক ট্রে অনুসারে খাবার বাড়াতে অথবা কমাতে হবে।

খ) ফিডিং ট্রে পদ্ধতিঃ

- এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খাবার ট্রে-তে দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা করা হয়।
- ট্রে'র সংখ্যা প্রতি হেক্টরে ৪০-৮০ টি।

এক্ষেত্রে প্রতিটি ট্রে চেক করা হয় চেক ট্রে পদ্ধতির মতোই। এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করে খাবার বাড়ানো কমানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে খাবার কম বেশি হলে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। খাবার নষ্ট হওয়ার আশংকা কম থাকে। এই পদ্ধতিতে খুব সহজেই খাবারের পরিমান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।
এই পদ্ধতিতে খাদ্য নিরূপণের হার নিম্নলিখিত সূত্র অনুসারে বের করা যায়-

$$FCR = \frac{\text{ব্যবহৃত খাদ্যের পরিমান (কেজি)}}{\text{সর্বমোট মাছের ওজন}}$$

যে সমস্ত বিষয় (ফ্যাক্টর) চিংড়ির খাদ্যের মাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো নিম্নরূপ-

- তাপমাত্রা
- চিংড়ির খোলস বদলানো
- অক্সিজেন
- p^H
- ঋতু

ভাল উৎপাদন পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটারের অনুমোদিত মাত্রা এবং চেক করার সময় নিম্নরূপ-

১. p^H	সকাল ৮.০০ - ১০.০০ টা	মাত্রা ৭.৫ - ৮.৫
	বিকাল ৩.০০ - ৫.০০ টা	মাত্রা ৭.৫ - ৮.৫
২. পানির স্বচ্ছতা	সকাল ৮.০০ - ১০.০০ টা	মাত্রা ৩০ - ৪৫ সেঃমিঃ
৩. পানির রং	সবুজ	
৪. তাপমাত্রা	২৮^{0}C - ৩২^{0}C থাকলে ভাল ফল পাওয়া যা।	
৫. অ্যালকালিনিটি	সপ্তাহে একবার	মাত্রা ৮০ - ১২০ ppm

চিংড়িকে যদি কম বিরতিতে খাবার দেওয়া যায় তবে সব সময় সতেজ খাবার খাওয়ার সুযোগ বেশি পাবে। ফলে খাদ্য থেকে পুষ্টি বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে যা চিংড়ির বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

খাদ্য সংরক্ষণঃ

ভাল উৎপাদন পাওয়ার জন্য খাদ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ করা খুবই জরুরী। খাদ্য সংরক্ষণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন-

- শুষ্ক, ঠাণ্ডা এবং বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে এমন জায়গায় খাদ্য রাখা উচিৎ নয়।
- সরাসরি মাটিতে অথবা পাকা মেঝেতে খাবার রাখা উচিৎ নয়।
- কাঠের ফ্রেমের উপর খাবার রাখলে ভাল হয়।
- ইঁদুর এবং পোকা মাকড় থেকে সাবধানে রাখতে হবে।
- ৩ মাসের অধিক সময় খাদ্য সংরক্ষণ না করাই ভাল।
- নষ্ট খাবার চিংড়ি মাছকে খাওয়ানো থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

পানিতে খাদ্যের স্থায়িত্বঃ

খাদ্য নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পানিতে খাদ্যের স্থায়ীত্ব। চিংড়ি মাছ ধীরে ধীরে খাদ্য গ্রহণ করে। খাবার ঘেরে দেওয়ার পর যদি দ্রুত পানিতে দ্রবিভূত হয়ে যায় তবে চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না। খাদ্য খেতে না পারলে চিংড়ির বৃদ্ধি ব্যহত হবে। ক্রমাগত খাদ্য পানিতে দ্রবিভূত হতে থাকলে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। পানি দূষিত হলে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে।
খাদ্যের স্থায়ীত্ব হচ্ছে খাবার পানিতে দেবার পর তা দ্রবীভূত হতে কত সময় লাগে। কম স্থায়ীত্বের খাবার খুব দ্রুত পানিতে মিশে যাবে। সুতরাং খাবার ব্যবহারের পূর্বে খাদ্যের স্থায়ীত্ব পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল। খুব সহজেই আমরা এই পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

মজুদ পরবর্তী সার ব্যবস্থাপনা ঃ

আবদ্ধ চাষ পদ্ধতিতে খাদ্য প্রদানের উপর নির্ভও করে চাষের সফলতা। এই পদ্ধতিতে মাছ আহরনের পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত এবং পরিমিত পরিমান খাদ্য প্রদান করতে হয়। তাই এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাবারকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় না। তবে পানির গুনাগুন এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের যেন প্রাচুর্য থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় এবং নিন্মলিখিত ছক অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসাওে সার প্রদান করা হয়।

	বিঘা প্রতি (কেজি)
চিটা গুড়	৪ কেজি
ইষ্ট	১/৪ চা চামচ
চালের কুড়া	২ কেজি

পানির গুনগত মানের উপর নির্ভও করে চিংড়ি আহরনের পূর্ব পর্যন্ত এই সার ব্যবহার করা যেতে পারে। চিটাগুড় পানির পি.এইচ কে স্থিত অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে এবং পানিতে বাফারিং সিস্টেম উন্নত করে। চিটাগুড় হতে উপকারী ব্যাকটেরিয়া সরাসরি খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে এবং সখ্যায় বৃদ্ধি পায় ফলে অপকারী ব্যাকটেরিয়া প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না।

উপসংহারঃ আবদ্ধ পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে খাদ্যের মান, স্থায়িত্ব এবং পরিমিত খাদ্য প্রদানের উপর। এ সকল বিষয়ের সাথে পানির গুনাগুন, পুকুরের পরিবেশ তথা অর্থনৈ তিক বিষয় জড়িত। সুতারং পোনা মজুদের প্রথম দিন থেকে চিংড়ি আহরণ পর্যন্ত সঠিক এবং পরিমিত পরিমানে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

পানির গুনাগুন (Water Quality)

ভূমিকা ঃ

বাগদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় চিংড়িকে সহনীয় পরিবেশ প্রদান করার জন্য পানির গুনাগুন স্থিতিশীল রাখা প্রয়োজন। সি এসটি পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় অধিক চিংড়ির চাষ হয় বলে প্রায় প্রতিদিন পানির গুনাগুন পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পানির যে সব গুনাগুণ বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল- তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির ঘোলাটত্ব এবং পানির ক্ষারত্ব ইত্যাদি।

নিম্নে পানির বিভিন্ন গুনাগুন সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

তাপমাত্রা ঃ

পানির উষ্ণ তাপমাত্রা চিংড়ির বৃদ্ধির জন্য খুবই উপযোগী। চিংড়ি বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে আদর্শ তাপমাত্রা ২৮° সেঃ থেকে ৩২° সেঃ মাপমাত্রা। প্রতি ১০° সেঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে চিংড়ি বৃদ্ধি ও বিপাক প্রক্রিয়া দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। যেমন ঃ একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে ২০° সেঃ তাপমাত্রার চিংড়ি যে হারে বৃদ্ধি পায় ৩০° সেঃ মাপমাত্রায় তার প্রায় দ্বিগুন পরিমান বৃদ্ধি ঘটে।

২৫° সেঃ এর কম তাপমাত্রায় চিংড়ি মজুদ করলে বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং বাগদা চিংড়ি চাপে পড়ে রোগাক্রান্ত হয়। আবার ৩৫° সেঃ এর উপরে, বাগদা চিংড়ি দূর্বল হয়ে মৃত্যু বরণ করে।
পানির কম গভীরতার জন্য তাপমাত্রা দ্রুত উঠানামা করে এবং বাগদা চিংড়ি চাপে পড়ে রোগাক্রান্ত হয়। এই জন্য সি এসটি পদ্ধতিতে ঘেরের পানির গভীরতা গড় ৩ ফুট বা তার উপরে রাখা উচিত, এতে তাপমাত্রা উঠানামা প্রশমিত হয়।

পানির লবণাক্ততা ঃ

বাগদা চিংড়ির বিপাক ক্রিয়া, অভিপ্রায়ন, প্রজনন ইত্যাদি কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে পানির লবণাক্ততা। বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য আদর্শ লবণাক্ততা হলো ১০-১৫ পিপিটি। এর থেকে কম বা বেশি লবণাক্ততায় চিংড়ির বৃদ্ধি ব্যবহত হয়। তবে বাগদা চিংড়ি ০-৫০ পিপিটিতে চাষ করা সম্ভব।

সমুদ্রের পানির লবণাক্ততায় নিম্নলিখিত প্রধান সাতটি উপাদান থাকে ঃ

উপাদান	পরিমাণ
সোডিয়াম	১০৫০০ মিঃ গ্রাম/লিটার
ম্যাগনেসিয়াম	১৪৫০ মিঃ গ্রাম/লিটার
ক্যালসিয়াম	৪০০ মিঃ গ্রামঃ/লিটার
পটাসিয়াম	৩৭০ মিঃ গ্রামঃ/লিটার
ক্লোরাইড	১৯০০ মিঃ গ্রাম/লিটার
সালফেট	২৭০০ মিঃ গ্রামঃ/লিটার
বাইকার্বনেট	১৪২ মিঃ গ্রামঃ/লিটার

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ঃ

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন চিংড়ি চাষের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পানির গুনাগুণ। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কিভাবে নিয়ন্ত্রীত রাখা যায় এই বিষয়টি চিংড়ি চাষীদের খুব ভালভাবে জানতে এবং বুঝতে হবে। সব সময় ৩.৫ পিপিএম এবং উপরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যথেষ্ট মাত্রায় দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকলে চিংড়ি তার খাদ্য গ্রহণ, বিপাকক্রিয়া, পানিতে পুষ্টির মিশ্রন এবং সর্বোপরি পানির পরিবেশ ভাল থাকে।

নিম্নে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ও এর প্রভাব উল্লেখ করা হল ঃ

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ	প্রভাব
১ মিঃ গ্রাম/ লিটার এর কম	যদি কয়েক ঘন্টার জন্য হয় তবে চিংড়ি মৃত্যুবরণ করবে।
১ থেকে ৩.৫ মিঃ গ্রাম/ লিটার	চিংড়ি বাঁচতে পারে তবে বৃদ্ধি কম হবে
সবসময় ৩.৫ মিঃ গ্রাম/ লিটার	চিংড়ির খুবই ভাল বৃদ্ধি হবে
সবসময় ৩.৫ মিঃ গ্রাম/ লিটার এর বেশি	সাধারণতঃ এই অবস্থা প্রাকৃতিকভাবে থাকে না। থাকলে চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর।

পানির ঘোলাটত্ব ঃ

পানির ঘোলাটত্বের মাধ্যমে বোঝায় যে পানিতে ভাসমান পলি, কাঁদা, প্লাঙ্কটন ইত্যাদি রয়েছে। যা পানির ভিতরে আলো প্রবেশে বাধা প্রদান করে। চিংড়ি চাষের জন্য পলি বা কাঁদার ঘোলাটত্ব তেমন কাঙ্খিত নয়। তবে প্লাঙ্কটন যেহেতু খাদ্য শৃঙ্খলের প্রাথমিক স্তর তাই প্লাঙ্কটনজনিত ঘোলাটত্ব কাঙ্খিত। সেচি ডিস্ক দ্বারা ঘোলাটত্ব মাপা যায়। চিংড়ি চাষের জন্য ৩৫-৪৫ সেঃ মিঃ ঘোলাটত্ব ভাল।

পানির ক্ষারত্ব ঃ

ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর দ্রবীভূত মাত্রা মিলিগ্রাম/মিটার এর উপর পানির ক্ষারত্ব নির্ভর করে। চিংড়ি চাষের জন্য ক্ষারত্ব ৭৫ মিঃ গ্রাম/লিটার। অনুমোদিত পানির গড় ক্ষারকত্ব ১২০ মিলিগ্রাম/লিটার এর উপরে হওয়া ভাল। ঘেরের মাটি অম্লযুক্ত হলে পানির ক্ষারত্ব কম হয়। আবার কম লবণাক্ততায়ও ক্ষারত্ব কম হয়। চিংড়ি ঘেরে ৮০ থেকে ১০০ পিপিএম ক্ষারত্ব বজায় রাখা ভাল, এই জন্য চুন বা ডলোমাইট প্রয়োগ করতে হয়। ডলোমাইট সবসময় ভাল মানের পাওয়া যায় না বলে পাথুরে চুন পূর্বে ফুটিয়ে ১০০ কেজি/হেক্টর মাত্রায় প্রয়োগ করা ভাল।

P^H ঃ

হাইড্রোজেন আয়নের ঋণাত্মক লগারিদমকে পানির P^H বলে। P^H পরিমাপ করে পানি এসিড না ক্ষার তাহা বুঝা যায়। নিরপেক্ষ P^H এর মান ৭। P^H এর মান ৭ এর কম হলে এসিড এবং বেশি হলে ক্ষার। সমুদ্রের পানির সাধারণ P^H ৮.৩।

$P^H = -\text{Log}\,[H^+]$

ঘেরের পানির P^H সকালের দিকে ৭.৫-৮.৫ চিংড়ি চাষের জন্য খুবই উপযোগী।
নিম্নে P^H এর মাত্রা এবং এর প্রভাব দেওয়া হল ঃ

P^H এর মাত্রা	প্রভাব
৪	অম্ল পানি, চিংড়ি মারা যাবে
৪ থেকে ৫	কোন প্রজনন ক্রিয়া হবে না।
৪ থেকে ৬	খুবই ধীর বৃদ্ধি
৬ থেকে ৯	খুবই ভাল বৃদ্ধি
৯ থেকে ১১	খুবই ধীর বৃদ্ধি
১১ এর বেশী	অধিক ক্ষারত্ব, চিংড়ি মারা যাবে।

কার্বন ডাই অক্সাইড ঃ

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার হয় বলে, দিনের বেলায় এর মাত্রা কম থাকে এবং রাতের বেলায় পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পানিতে ৬০ মিঃ গ্রাম/লিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকলে চিংড়ি বাঁচতে পারে। কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পমিরাণ বৃদ্ধি পেলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। সে জন্য মেঘলা আবহাওয়াই কার্বন ডাই অক্সাইড এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এ্যামোনিয়া ঃ

পানিতে দুইভাবে এ্যামোনিয়া পাওয়া যায়, যথাঃ- এ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^+), আনআয়নাইজড এ্যামোনিয়া (NH_3)। চিংড়ি চাষের পুকুরে ২ মিঃ গ্রাম/লিটার এর কম এ্যামোনিয়া থাকা ভাল। যদিও এর পরিমাণ বেশি হলে সহজে চিংড়ি মারা যায় না, তবে চিংড়ি ষ্ট্রেচে/ চাপে পড়ে।
অতিরিক্ত খাবার, ইউরিয়া বা এ্যামোনিয়া আছে এইরূপ সার ব্যবহার এর কারণে পানিতে এ্যামোনিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পানি পরিবর্তন বা হরড়া টানার মাধ্যমেই এ্যামোনিয়ার পরিমান কমানো যায়। তবে জিওলাইট অথবা উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে অ্যামোনিয়া পরিমানমত রাখা সম্ভড়া হয়।

নাইট্রেট ঃ

পানিতে চিংড়ি চাষের জন্য নাইট্রেট ২ মিঃ গ্রাম/লিটার এর কম থাকা ভাল। যদিও তেমন শোনা যায় না যে ঘেরে নাইট্রেট এর পরিমান বেশি এবং এর ফলে চিংড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে নাইট্রেট বেশি হলে চিংড়ির রক্তে মিশে তা অক্সিজেন প্রবাহ বাধাগ্রস্থ করে।

হাইড্রোজেন সালফাইড ঃ

হাইড্রোজেন সালফাইড এর যে কোন মাত্রা চিংড়ি চাষের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে পি এইচ যদি কম থাকে তখন হাইড্রোজেন সালফাইড বিষাক্ত হয়। পানি পরিবর্তন করে এবং মাঝে মধ্যে চুন ব্যবহার করে চিংড়ি ঘেরে হাইড্রোজেন সালফাইড কমানো সম্ভব হয়।

উপসংহারঃ
যেহেতু চিংড়ি পানিতে থাকে এজন্য পানির সকল গুনাগুনের প্রতি অধিক সংবেদনশীল হয়। চিংড়ির বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি, খাদ্য গ্রহন এবং মোল্টিং ইত্যাদি নির্ভর করে পানির উপরোক্ত পরিমাপক সমুহের উপর। সুতারং পানি পরিবর্তন বা অন্যান্য সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে পানির সকল গুনাগুন ঠিক রেখে অল্প জায়গয় অধিক উৎপাদন আশা করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা (Disease Management)

ভুমিকাঃ

Prevention is better than cure এই প্রবাদ বাক্যটি বাগদা চিংড়ির জন্য খুবই সত্য। শরীর এবং মনের অস্ভাবিক অবস্থাই রোগ। বর্তমানে চিংড়ি চাষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা হলো রোগ। অন্যান্য প্রাণীর মতো চিংড়িরও বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। যখন চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় তখন জীবাণু দ্বারা বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগোক্রান্ত হয়। যে সমস্ত জীবাণু দ্বারা চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয় তার মধ্যে পরজীবি, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস উল্লেখযোগ্য। দুর্বল পরিবেশ, অপুষ্টিজনিত এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান (যেমন লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, পিএইচ, অক্সিজেন ইত্যাদি) অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হলে চিংড়িতে রোগ হয় ফলে চিংড়ি মারা যায়।

রোগ হলো ঘেরের পরিবেশ, পরজীবি এবং চাষকৃত চিংড়ির ম্যধকার মিথস্ক্রিয়ার শেষ ফলাফল। আমাদের চাষকৃত চিংড়ি প্রতিনিয়ত পরিবেশের তারতম্য, অব্যবস্থাপনা যেমন অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি নাড়াচাড়া, অধিক মজুদ ঘনত্বে চিংড়ির পিএল পরিবহন ও অধিক ঘনত্বে ঘেরে চাষ করা, বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহার, অপুষ্টি, তাপমাত্রার পরিবর্তন, পানি দুষণ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সমস্ত অব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের তারতম্যের জন্য চিংড়ি আঘাত বা চাপ খায় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু চিংড়িকে আক্রান্ত করে। পরজীবি, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ মূলতঃ এই সমস্ত কারণেই হয়। ভাইরাস জনিত রোগের কোন প্রতিকার নেই তবে প্রতিরোধ আছে।

রোগের কারনঃ

চিংড়ির রোগ মূলতঃ দূর্বল পরিবেশ, জীবাণু এবং চিংড়ির (আশ্রয়দাতা) মিথস্ক্রিয়ায় ফলাফল (চিত্র ১)। রোগের জীবাণু থাকা সত্ত্বেও তা আক্রান্ত করতে পারেনা যদি চাষকৃত ঘেরের পরিবেশ চিংড়ীর জন্য উপযোগী হয় (চিত্র ২)। ঘেরের চাষকৃত চিংড়ি মূলতঃ আঘাত বা চাপ পায় যখন ঘেরে পানির তাপমাত্রা উঠানামা করে, পানির গুনাগুণের পরিবর্তন হয়, লবণাক্ততার কমবেশি হয়, অধিক ঘনত্বে চিংড়ি চাষ ও পোনা পরিবহন এবং অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি নাড়াচাড়া করা হয়।

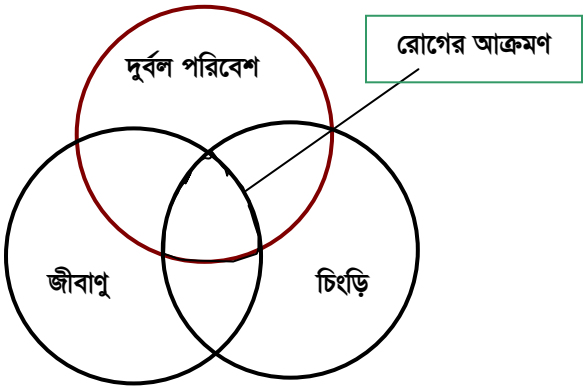

চিত্র ১

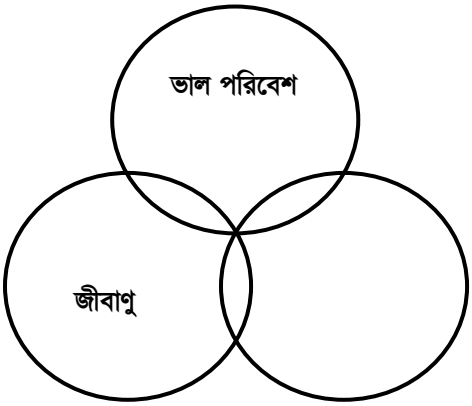

চিংড়ি পরিবেশের তারতম্য ও অব্যবস্থাপনাজনিত কারন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে কিন্তু বেশি সময় ধরে চলতে থাকলে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয় এবং অবশেষে মৃত্যু বরণ করে।

চিংড়ির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন রোগের কারন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. হোয়াইট স্পট রোগঃ

হোয়াইট স্পট (WSSV-white spot syndrome virus) নামক এই ধ্বংসাত্মক ভাইরাসজনিত রোগের কারণে বাংলাদেশের লোনা পানির চিংড়ি শিল্প বিগত ১১ বছর যাবৎ আক্রান্ত হয়ে আসছে। ১৯৯৪ বা ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম হোয়াইট স্পট রোগের আগমন ঘটে। যার ফলে এই শিল্পের সাথে জড়িত সবাই (চাষী, ছোট ব্যবসায়ী, ডিপো মালিক, প্রসেসর) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট রপ্তানি আয় কমে যায় এবং এই শিল্পের বিকাশ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে চিংড়ি শিল্পের সাথে জড়িত সমস্ত সুফলভোগীরা ক্ষতি স্বীকার করে বা স্বল্প লাভে এই শিল্প পরিচালিত করছে। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। যখন কোন ঘেরের চিংড়ি হোয়াইট স্পট রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তা মহামারি রূপ ধারণ করে এবং ১০০ ভাগ চিংড়ি মারা যায়। কারণ হোয়াইট স্পট রোগ, ভাইরাসের কারণে হয় এবং যার কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আবিস্কার হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রচলিত নিয়মে চাষকৃত ঘেরের চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি বা সফলভাবে চাষ করার কোন যথাযথ পন্থা/নিয়ম নেই। হোয়াইট স্পট রোগ একই জাতীয় অনেকগুলো ভাইরাস এর কারণে হয় এবং এর বিস্তৃতি বিভিন্ন দেশজুড়ে। এখন পর্যন্ত যে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে সমস্ত ভাইরাসই হোয়াইট স্পট রোগের জন্য দায়ী নয়। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চলছে। হোয়াইট স্পট রোগ যে ভাইরাসের আক্রমণে হয় তার নাম হলো- Systemic Ectodermal and mesodermal Buculovirus (SEMBV) যা ১৯৯৩ সালে প্রথম চীন দেশে পিনিয়াস চাইনেনসিস (Penaeus chinensis) নামক প্রজাতির চিংড়িকে আক্রমণ করে। ১৯৯৪ সালে একই ভাইরাস এর আক্রমণে ভারতে সাদা চিংড়ি পিনিয়াস মারজিনিসিস (Penaeus merguiensis) এবং পিনিয়াস ইন্ডিকাস (Penaeus indicus) এবং টাইগার চিংড়ি পিনিয়াস মনডন (Panaeus monodon) এ ঘটে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এই রোগের প্রাদুর্ভাব তাইওয়ান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডে দেখা যায়। এই রোগের কারণে কিছু দেশের নির্দিষ্ট চিংড়ি চাষ এলাকায় এবং অনেক দেশ যেমন তাইওয়ান, চীন, থাইল্যান্ডের কিছু অংশ, ভারতের দক্ষিণ কোষ্টাল জোন এবং বাংলাদেশে চিংড়ির চাষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রোগের কারন ও প্রতিরোধঃ

১. আনুভুমিক ভাবে (Horizontal transmission)
২. উল্লম্ব ভাবে (Vertical transmission)

১. আনুভুমিক ভাবে ঃ

যে মা চিংড়ি থেকে ডিম ফুটানো হয় বা পি এল তৈরী করা হয় উক্ত মা চিংড়িতে হোয়াইট স্পট ভাইরাস থাকলে পি এল এই ভাইরাস চলে আসে।

প্রতিরোধঃ পি সি আর পরীক্ষার মাধ্যমে পজিটিভ বা ভাইরাসযুক্ত মা চিংড়ি থেকে হ্যাচিং না করানো অর্থ্যাৎ ভাইরাসমুক্ত পি এল ঘের বা নার্সারীতে মজুদ করা।

২. উল্লম্ব ভাবেঃ

মজুদকৃত ঘেরের পানিতে অথবা পাশের ঘের হইতে কোন বাহকের(সাপ, ব্যাঙ, কাকড়া, পাখি ইত্যাদি) মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে।

প্রতিরোধঃ মজুদ ঘেরের পানি জীবানুমুক্ত করা এবং পাশের ঘেরের পানি বা বাহক না আসাতে পারে তার সকল ব্যবস্থা করা। যেমনঃ

- মজুদ ঘেরের পানিতে পরিমানমত ব্লিচিং প্রয়োগ
- ঘেরের চারিদিকে সবুজ নেটের বেড়া দেওয়া
- শক্ত মজবুত করে ঘেরের চারিদিকে বাঁধ নির্মান করা

হোয়াইট স্পট রোগের লক্ষণসমূহঃ

- খাদ্যে মন্দাভাব বা খাদ্যে অরুচি।
- খাদ্য নালীতে খাবার শুণ্য।
- চিংড়ি দেখতে দুর্বল এবং দ্রুত নড়াচড়া না করা।
- চিংড়ি পানির উপর উঠে আসে এবং সাঁতার কাটতে থাকে।
- দিনের বেলা চিংড়ি ঘেরের পাড়ে এসে জমা হয়।

ক্লিনিক্যাল লক্ষণসমূহঃ

- চিংড়ির রং পীতবর্ণ বা লালচে হয়।
- কারাপ্যাস এর দুই পার্শ্বে ০.৫ মি মি-২-০ মি মি আয়তনের সাদা স্পট দেখা যায় এবং লেজেও এই ধরনের স্পট দেখা যায়। রোগ আক্রমণ মারাত্মক হলে সমস্ত দেহে স্পট দেখা যায়।
- চিংড়ি সমস্ত দেহে হোয়াইট স্পট দেখা দিলে চিংড়ির মড়ক শুরু হয়।
- চিংড়ির মড়ক পর্যায়ক্রমে শুরু হয় এবং ১০০ ভাগ চিংড়ি মারা যায়।
- ২-৩ দিনের মধ্যে সমস্ত জূবেনাইল চিংড়ি মারা যায় এবং ৩-১০ দিনের মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক চিংড়ি মারা যায়।
- মারাত্মক আক্রমনের ফলে পাকস্থলী এবং ফুলকা নষ্ট হয়ে যায়।

WSSV বা হোয়াইট স্পট রোগের কোন চিকিৎসা নেই। চাষীর এই রোগ এর আক্রমনের ফলে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিয়মিত খামার পরিদর্শন করতে হবে এবং রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সাথে সাথে চিংড়ি আহরণ শুরু করতে হবে। কখনও কখনও আক্রান্ত চিংড়ি সরিয়ে ফেললে বাকী চিংড়ি আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় এবং মোট উৎপাদন ভাল হয়।

২। মস্তক হলুদ রোগ (ইয়োলো হেড ডিজিজ)ঃ

ইয়োলো হেড নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়। যকৃত অগ্নাশয়, গ্রন্থি ফ্যাকাশে হওয়ার ফলে মস্তক হলুদ বর্ণ ধারন করে। পোনা মজুদের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে এই রোগ ধরা পড়ে। এ রোগেও ব্যাপক আকারে চিংড়ি মারা যায়।

প্রতিরোধঃ সুষ্ঠ খামার ব্যবস্থাপনার ফলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। খামারের তলদেশে ভলোমত রোদে শুকিয়ে চাষ করে বিচিং পাউডার/চুন দিয়ে ভালো করে মাটি শোধন করে নিতে হয়।

৩। চিংড়ির কালো ফুলকা রোগ (ব্লাক গিল ডিজিজ)ঃ

পুকুরের তলায় মাত্রাতিরিক্ত হাইড্রোজেন সালফাইট এবং অন্যান্য জৈব পদার্থের কারনে এ রোগ দেখা যায়। খাদ্য গ্রহনে অনীহা দেখা দেয়। আক্রান্ত চিংড়ি ধীরে ধীরে মারা যায়। বড় চিংড়িতে এ রোগ বেশী হয়।

প্রতিরোধঃ পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে তলদেশের কাদামাটি তুলে ভালমত শুকিয়ে এবং পরিমানমত চুন/ডলমাইট/বিচিং পাউডার দিতে হবে। পুকুরের পাড়ে পাতা ঝরা গাছ কেটে ফেলতে হবে।

৪। কালো দাগ রোগ (ব্লাক স্পট /সেল ডিজিজ)ঃ

এটা চিংড়ির এক মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। পুকুরে অত্যাধিক জৈব পদার্থ থাকার কারনে এ রোগ হয়। চিংড়ির খোলস লেজ ও ফুলকায় কালো দাগ হয়। খোলসের গায়ে ছিদ্র হয়। পরবর্তীতে ফাংগাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চিংড়ি মারা যায়।
প্রতিরোধঃ পুকুরের তলায় পঁচা কাদা মাটি তুলে ভালমত শুকিয়ে চুন/সার দিয়ে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে। চাষকালীন সময়ে নিয়মিত পানি পরিবর্তনসহ সুষম খাদ্য ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

৫। সাদা মাংস রোগ (হোয়াইট মাসেল ডিজিজ)ঃ

চিংড়ির লেজের দিক থেকে মাংস সাদা ও শক্ত হয়ে যাওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। অধিক ঘনত্ব, প্রচুর জৈব পদার্থ ও তাপমাত্রার আধিক্যের কারনে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়।

প্রতিরোধঃ পানির গভীরতা ও পোনা মজুদ হার সঠিক মাত্রায় রাখতে হবে।

৬। খোলস নরম রোগ (সফট সেল ডিজিজ)ঃ

এটা একটা সাধারন রোগ। ক্যালসিয়াম জনিত পুষ্টি অভাবে এ রোগ হয়। অনেকে একে স্পঞ্জ রোগ বলে থাকে। পানির লবনাক্ততা কমে গেলেও এই রোগে বাগদা চিংড়ি আক্রান্ত হতে পারে। খোলস বদলানোর ২৪ ঘন্টা পরও শক্ত হয় না, কম বাড়ে ও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে মারা যায়।

প্রতিরোধঃ ভালমত পুকুর শুকিয়ে চুন দিয়ে চাষের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রোগের আক্রমন হলে বড় চিংড়ি ধরে ফেলতে হবে। খামারে পানি নিষ্কাশনের ও প্রবেশের পৃথক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭। চিংড়ীর গায়ে শেওলা সমস্যা (এক্সটারনাল ফাউলিং অফ শ্রিম্প)ঃ

বদ্ধ পানিতে অতিমাত্রায় খাদ্য প্রয়োগে সবুজ শেওলার আধিক্যের কারনে এ সমস্যা হয়ে থাকে। সাধারনত ছোট ছোট খামারে বিশেষ করে গলদা খামারে গায়ে শেওলা রোগ বেশি দেখা যায়। খোলস বদলাতে পারে না, বৃদ্ধি কম হয়, চিংড়ি আস্তে আস্তে মারা যায়।

প্রতিরোধঃ পানির গভীরতা বাড়াতে হবে। মজুদ হার কমাতে হবে। চুন/সার ও খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা সীমিত রাখতে হবে।

৮। ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ (ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ)ঃ

চিংড়ি বিভিন্নপ্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে ভিবরিও, সিডোমনাস, কাইটিনোভারাস এবং ফিলামেন্টাস ব্যাকটেরিয়া অন্যতম। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমনে চিংড়ীর খোলসে কাল কাল স্পট সৃষ্টি হয়। খোলস ভেঙ্গে যায়, রং পরিবর্তন, রক্ত প্রবাহ কমে যায়, লেজের অংশ ও অন্যান্য উপাঙ্গ খসে পড়ে। এতে চিংড়ির ব্যাপক মৃত্যু হয় ও উৎপাদন মারাত্মক ভাবে কমে যায়।

প্রতিরোধঃ ভালমত শুকিয়ে চুন/সার প্রয়োগ করে পুকুর প্রস্তুত করতে হবে এবং পানির সরবারহ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।

৯। ছত্রাক রোগ (ফাংগাল ডিজিজ)ঃ

দীর্ঘদিন পানি পরিবর্তন না করলে স্যাপ্রোরেগনিয়া ছত্রাক দ্বারা চিংড়ি বেশি রোগাক্রান্ত হয়। এর আক্রমনের ফলে চিংড়ীর ফুলকায় ফোটা ফোটা দাগ দেখা যায়। এতে খোলস নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাচারীতেও লার্ভি, পি-এল বেশি আক্রান্ত হয়।

প্রতিরোধঃ পুকুর বা ঘেরের তলা ভালোভাবে শুকিয়ে চুন প্রয়োগ করে চাষের জন্য তৈরী করতে হবে।

১০। অপুষ্টি জনিত রোগ (নিউট্রেশনাল ডিপিসিয়েন্সি ডিজিজ)ঃ
চিংড়ির খাদ্যে প্রয়োজনীয় এ্যামাইনো এসিড, কোলেষ্টেরল, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন - সি এর অভাবে অপুষ্টি জনিত রোগ হয়ে থাকে।
প্রতিরোধঃ সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। নিয়মিত চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১। প্রোটোজুয়া জনিত রোগ (প্রোটোজুয়ান ডিজিজ)ঃ

প্রটোজুয়া কমেনসেলস, এপিটাইলিস, সিলিয়েট এবং যুথানিয়ামি এর কারনে নানাবিধ রোগ হয়। এক বা একাধিক প্রটোজুয়ার আক্রমনে চিংড়ির খোলস, পুষ্টিতন্ত্র এবং ফুলকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অসাস্থকর ঘেরে এ রোগ দেখা দেয়।

প্রতিরোধঃ পুকুর বা ঘেরের তলদেশের বর্জ্য পদার্থ ও কালো মাটি তুলে ফেলতে হবে এবং যুথানিয়াম আক্রমন প্রতিরোধে পুকুর প্রস্তুতের সময় বিচিং পাউডার এবং ফরমালিন ব্যাবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

উপসংহারঃ আমাদের দেশে প্রতি বছর রোগের কারনে অনেক চাষী সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অতি পরিচিত হোয়াইট স্পট রোগ আবদ্ধ চাষ পদ্ধতিতে প্রতিরোধ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। চিংড়ি, জীবানু এবং পরিড়্রোশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চাষ করলে একদিকে যেমন রোগের পরিমান কমবে অন্যদিকে উৎপানের পরিমান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

আহরন এবং আহরনোত্তর ব্যবস্থাপনা
(Harvesting and Post Harvesting Management)

ভূমিকাঃ

চিংড়ি শিল্পের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ির গুনগত মানের বিষয়ে যে সমস্ত অভিযোগ[১] উত্থাপিত হয় তার অনেকগুলিই চিংড়ির ঘেরে অথবা খামারে এবং আহরণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানের অভাবের কারণেই এটি হয়ে থাকে। আহরণের সময় থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পৌছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় পরিচর্যার অভাবেই চিংড়ির গুনগত মানের বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনভাবে একবার গুনগত মানের অবনতি হলে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং ঘের/খামার এবং প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ধাপগুলিতে চিংড়িকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করা খুবই জরুরী। আহরণোত্তর পরিচর্যার ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষীকে কি করতে হবে সেটি যেমন জানতে হবে, একইসাথে পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিচর্যার বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ, অনেকগুলো ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষী নিজেই আহরণ পরবর্তী ধাপগুলিতে জড়িত থাকেন।

গুনগত মান বলতে আমরা কি বুঝি?

কোন খাদ্যদ্রব্যের গুনগত মান বলতে ঐ খাদ্যের সহজাত উপাদানের এমন বৈশিষ্টকে বুঝায় যা ভোক্তার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যটি খাওয়া নিরাপদ কিনা সেটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ কোন খাদ্যের মান বলতে শুধুমাত্র তার উপাদানের বৈশিষ্টকে বুঝায় না; একই সাথে সেটি খেয়ে ভোক্তা অসুস্থ হবেন না - এ বিষয়টিও গুনগত মানের অন্তর্ভুক্ত।

চিংড়ির মান কিভাবে নষ্ট হয়?

আমরা জানি আহরণের পর পরই চিংড়ির গুনগত মান বিনষ্টের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু আহরণ পূর্ব ও আহরণকালীন কিছু কার্যাবলী চিংড়ির মান বিনষ্টের এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে থাকে। প্রধানতঃ ২টি কারণে চিংড়ির গুনগত মান বিনষ্ট হয়ঃ

ক. ব্যাকটেরিয়া এবং খ. এনজাইম

ব্যাকটেরিয়া চিংড়ির অন্ত্রে ও দেহের উপরে এবং এনজাইম পরিপাকতন্ত্রে বিদ্যমান থাকে। জীবিত অবস্থায় এরা চিংড়ির কোন ক্ষতি করতে না পারলেও মৃত্যুর পর পরই এরা গুনগত মান বিনষ্টের প্রধান কারণ হয়ে দাড়ায়। মৃত্যুর পর পরই চিংড়ির অন্ত্রে ও দেহের উপরে বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়াগুলি সক্রিয় হয় এবং বংশ বৃদ্ধি করে। সহায়ক পরিবেশে (উপযুক্ত তাপমাত্রা, খাদ্য ও পানি) ব্যাকটেরিয়া প্রতি ১০ মিনিটে দ্বিগুন হয়। এই হিসাবে ৩ ঘন্টা ২০ মিনিটে ১টি ব্যাকটেরিয়া ১০,০০,০০০ এ বৃদ্ধি পায়। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়াগুলি খাদ্য গ্রহণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চিংড়িকে নষ্ট করে ফেলে। একই সময়ে চিংড়ির পরিপাকতন্ত্রে বিদ্যমান এনজাইম বা জারকরসও চিংড়িকে নষ্ট করে ফেলে। চিংড়ির আহরণ, আহরণোত্তর এবং বিপনন পর্যায়ে গুনগত মান সংরক্ষণের কৌশল মূলতঃ উল্লেখিত ২টি বিষয়কে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই নিহিত। আমরা জানি নিম্ন তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার স্থবির হয়ে যায়। একই ভাবে এনজাইমের ক্রিয়াও ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসে। তাই আহরণের পর থেকে বিপননের শেষ পর্যন্ত চিংড়িকে স্বাস্থসম্মতভাবে পরিচর্যা এবং নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে গুনগত মান বজায় রাখা সম্ভব।

CST পদ্ধতিতে সাধারনত ১০০ - ১২০ দিনের মধ্যে চিংড়ি আহরন উপযোগী (২৫ - ৩০ গ্রাম) ওজনের হয়। এই পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ি একত্রে আহরন করাই উরম। তবে বাজার মূল্য, পুকুরের অবস্থা বিবেচনা করে আংশিক আহরন করা যেতে পারে। চিংড়ি আহরনের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যবস্হা গ্রহন করা উচিৎ।

---

[১] চিংড়ির গুনগত মানের বিষয়ে বিদেশী ক্রেতাদের থেকে পাওয়া অভিযোগের মধ্যে ক্ষতিকর জীবানুর (স্যালমোনেলা, ভিব্রিও কলেরা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইত্যাদি) উপস্থিতি, ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিকের (ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফিউরান্স) ও গ্রোথ হরমোনের উপস্থিতি, ভিজিয়ে ওজন বাড়ানো (Soaked), বিভিন্ন অপদ্রব্যের উপস্থিতি (পুশ) ও বিভিন্ন নোংরা বস্তুর উপস্থিতি ইত্যাদি।

১) প্রয়েজনীয় লোকবল সংগ্রহ করে রাখা
২) বাজার মূল্য সম্পর্কে খোজ খবর নেওয়া
৩) প্লাষ্টিক ঝুড়ি, ঝাকি জাল সংগ্রহ/ মেরামত করা
৪) দরকারী আহরনোওর সংরক্ষন সামগ্রী যেমন- বরফ, ওজান সহ পাল্লা, প্লাষ্টিক ঝুড়ি ইত্যাদি চিংড়ি আহরনের পুর্বেই সংগ্রহ করা।
৫) ভোরে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরণ করা্
৬) একদিন আগে খাবার দেওয়া বন্ধ করতে হবে।
৭) যদি তৈরী খাবারে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ও অন্যান্য রাসায়নিকদ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে খাদ্য প্রস্তুতকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর চিংড়ি আহরণ করতে হবে।
৮) আহরণের সময় সরঞ্জাম ও পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিংড়ির যাতে কম পিড়ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গই ব্যবস্থার পরিবর্তে উপযুক্ত ফাঁদ ও নির্ধারিত ফাসের ঝাঁকি জাল দিয়ে চিংড়ি ধরলে কম পিড়ন হয়।
৯) চিংড়ি অধিক আঘাত পায়, অঙ্গ বিনষ্ট হয় এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এমন কোন পদ্ধতি, কৌশল কিংবা সরঞ্জাম দিয়ে চিংড়ি আহরণ থেকে বিরত থাকা।
১০) চিংড়ি আহরণের পর বরফ ঠান্ডা পানিতে ভালকরে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোন কাদা বা ময়লা না থাকে।

চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি খোলস পরিবর্তন করে। আর এটা নির্ভর করে চন্দ্র মাসের আমাবশ্যা বা পূর্নিমার সাথে। এজন্য sampling করে মাছের অবস্থা পর্যবেক্ষন করে পূর্ণ চন্দ্র বা নতুন চাঁদে চিংড়ি আহরন করা হয়।

চিংড়ি ধরার পদ্ধতিঃ

পুকুরের পানি কমিয়ে ঝাকি জাল ব্যবহার করে চিংড়ি আহরন করা হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে আটল, বেড় জাল ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে কোন অবস্থায় যেন চিংড়ির গুনগত মান নষ্ট না হয়।

আহরন পরবতী ব্যবস্থাপনাঃ

যেহেতু চিংড়ি ধরার পর বিদেশে রপ্তানী করা হয় এজন্য আহরন পরবর্তী সকল ধাপ সতর্কতার সাথে পালন করা উচিৎ। খাদ্য নিরাপত্তার সকল ধাপ অনুসরন করতে হবে।

- আহরনকৃত চিংড়ি জীবন্ত অবস্থায় পানিতে চিলিং তাপমার্তায়(১^{o} সেঃ) ৫ মিনিট রাখা।
- চিংড়ি ও বরফের উপযুক্ত অনুপাত(চিংড়িঃ বরফঃঃ ২ঃ১) মেনে ফ্যাক্টরীতে পাঠান।
- চিংড়িকে পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করা।
- চিংড়ি আহরন থেকে ফ্যাক্টরীতে পাঠানোর সময় যত কম ততই ভাল।
- এই পদ্ধতিতে যেহেতু অনেক চিংড়ি এক সাথে ধরার সুযোগ থাকে সে কারনে রিফ্রিজারেশন ভ্যানে পরিবহন করলে ভাল হয়।

বাজারজাতকরন (Marketting)

ভূমিকাঃ

আমাদের দেশে যে কোন পণ্যের বাজারজাত করার ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তেমনি চিংড়ির বাজারজাত করার ক্ষেত্রেও একটি লম্বা শিকল দেখা যায়।ঘের/খামার এবং প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিদ্যমান ভৌত ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, প্রয়োজনীয় উপকরণ, বরফ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন যান, পরিবহন ব্যবস্থা, ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এটি সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বিপনন পর্যায়ে চিংড়ির মত পঁচনশীল একটি পণ্যের জন্য এত লম্বা একটি শিকল এর গুনগত মান বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ।
নিচে চিংড়ি আহরণ ও বিপননে সংশ্লিষ্ট ধাপসমুহের একটি নমুনা ডায়াগ্রাম দেয়া হ'লঃ

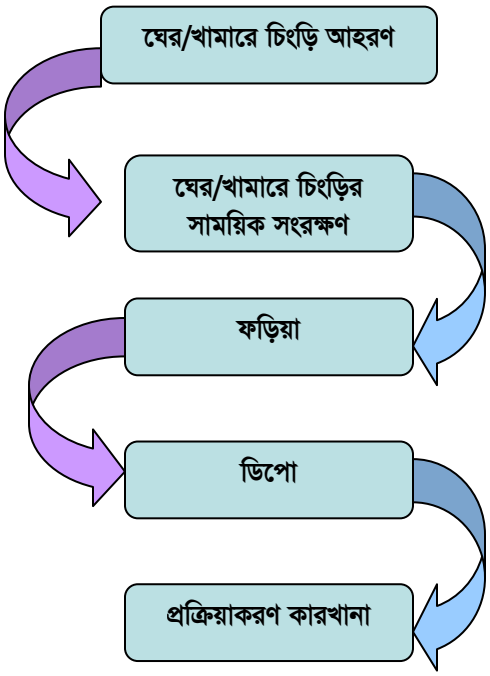

চিত্র- চিংড়ির আহরণ ও বিপনন পর্যায়ের ফ্লো ডায়াগ্রাম।

এ শিকলে বাড়তি একটি ধাপ মানেই চিংড়ির গুনগত মানের বাড়তি অবনতি। আদর্শ বিপনন ব্যবস্থায় এরূপ অনাবশ্যক ধাপের উপস্থিতি কাম্য নয়। ঘের থেকে চিংড়ি ধরার পর সরাসরি কারখানায় সরবরাহ করা সম্ভব হলে চিংড়ির গুনগত মান সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগের সিংহভাগই দূর করা সম্ভব হবে পাশাপাশি আমাদের চাষীরা বাজারমূল্য বেশী পেত। পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে এরূপ ব্যবস্থা বেশ আগে থেকেই চালু আছে। তবে লম্বা শিকলের প্রতিটা ধাপে কিছু ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কিছু পরিচর্যার মাধ্যমে বিশ্ববাজারে চিংড়ির ইমেজ ধরে রাখা সম্ভব।

আহরণের সময় করণীয় কাজঃ

১। ভোরে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় চিংড়ি আহরণ করা
২। একদিন আগে খাবার দেওয়া বন্ধ করতে হবে।
৩। যদি তৈরী খাবারে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ও অন্যান্য রাসায়নিকদ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে খাদ্য প্রস্তুতকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর চিংড়ি আহরণ করতে হবে।
৪। আহরণের সময় সরঞ্জাম ও পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিংড়ির যাতে কম পিড়ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গই ব্যবস্থার পরিবর্তে উপযুক্ত ফাঁদ ও নির্ধারিত ফাসের ঝাঁকি জাল দিয়ে চিংড়ি ধরলে কম পিড়ন হয়।

৫। চিংড়ি অধিক আঘাত পায়, অঙ্গ বিনষ্ট হয় এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এমন কোন পদ্ধতি, কৌশল কিংবা সরঞ্জাম দিয়ে চিংড়ি আহরণ থেকে বিরত থাকা।
৬। চিংড়ি আহরণের পর বরফ ঠান্ডা পানিতে ভালকরে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোন কাদা বা ময়লা না থাকে।

ঘের/খামারে সাময়িক সংরক্ষণঃ

ক) ভৌত অবকাঠামোঃ

১। আহরণের পর ভালভাবে ধোয়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।
২। চিংড়ি ধরেই তা ছায়ায় রাখার জন্য উপযুক্ত ছাউনি তৈরী করতে হবে। এ ছাউনিতে মাছি, কীট-পতঙ্গ, পাখি, কুকুর, বিড়াল বা অন্য কোন প্রাণী যাতে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
৩। ধরার পর চিংড়ি রাখার জন্য পাকা, মসৃণ ও পরিষ্কার মেঝে বা বড় প্লাষ্টিক শীটের ব্যবস্থা রাখা।
৪। স্বাস্থ্যসম্মত বরফের সরবরাহ রাখা এবং বরফ সংরক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রাখা।
৫। প্লাষ্টিকের ট্যাঙ্কে "বরফ-ঠান্ডা" পানির ব্যবস্থা রাখা।
৬। চিংড়ি পরিবহনের জন্য জীবাণুমুক্ত প্লাষ্টিকের বাক্সের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৭। চিংড়ি হ্যান্ডলিং এর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত সরঞ্জামের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৮। প্লাষ্টিকের ঝুড়ি, বাক্স এবং অন্যান্য সরঞ্জাম পরিষ্কার করার জন্য ডিটারজেন্টে ও জীবাণুনাশকের (ব্লিচিং পাওডার) সরবরাহ রাখা।

খ) করণীয় কাজঃ

১। ধরার পর চিংড়ি রোদে না রেখে ছাউনির মধ্যে রাখতে হবে।
২। ধরার পর চিংড়িকে ছাউনির মধ্যে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত মসৃণ পাকা জায়গায় অথবা পরিষ্কার প্লাষ্টিকের শিটের উপর রাখতে হবে।
৩। পরিষ্কার ও শীতল পানিতে চিংড়িকে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
৪। পরিষ্কার চিংড়িকে ভাল পানি দিয়ে তৈরী কুচি বরফের মধ্যে রাখতে হবে। প্লাষ্টিকের বাক্সের মধ্যে প্রথমে বরফের একটি স্তর, তারপর চিংড়ির একটি স্তর, তারপর আবার বরফ- এভাবে সাজাতে হবে।
৫। খামারে চিংড়ির মাথা না ছাড়ানো; হ্যাসাপ নীতি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে চিংড়ির মাথা ছাড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
৬। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চিংড়িকে ডিপো/আড়তে/সার্ভিস সেন্টারে/সরাসরি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পরিবহনের ব্যবস্থা করা।
৭। বরফে ঠান্ডা করা আস্ত চিংড়ি কুচি বরফের মধ্যে প্লাষ্টিকের বাক্সে ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাকে বা ভ্যানে পরিবহন করা।
৮। পরিবহনে কত সময় লাগবে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা কত তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণতঃ চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ১:১ । দিনের তাপমাত্রা ও দূরত্বের বিবেচনায় প্রয়োজনে বরফের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে।
৯। পরিবহনের সময় চিংড়িতে যেন চাপ না লাগে সেজন্য উপযুক্ত ডিজাইনের শক্ত প্লাষ্টিকের বাক্সে চিংড়ি পরিবহন করা। উপযুক্ত ডিজাইনের বাক্স উপর্যুপরি সাজিয়ে রাখলেও নিচের বাক্সের চিংড়িতে একটুও চাপ পড়বেনা। পক্ষান্তরে, ঝুড়ির উপর ঝুড়ি রাখলে উপরের ঝুড়ির চাপে নিচের ঝুড়ির চিংড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
১০। প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে বাঁশের ঝুড়ি, হোগলার পাটি, চট ও কলা পাতা ব্যবহার না করা।
১১। ধরার পর যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে চিংড়িকে গন্তব্য স্থানে পৌছানো।
১২। পরিবহনের পর পরিবহন যান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক দিয়ে ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা।

বি:দ্রঃ চিংড়ি পরিবহণের কাজে বাঁশের ঝুড়ি বা চাটই, হোগলার পাটি, চট, ইত্যাদির ব্যবহার হ্যাসাপ নীতি মোতাবেক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চিংড়ি পরিবহণের জন্য উপযুক্ত ডিজাইনের প্লাষ্টিক বাক্স ব্যবহারের নিয়ম।

ফড়িয়ার জন্য করণীয়ঃ

বিদ্যমান বিপনন ব্যবস্থায় এ ধাপটি চিংড়ির মান বিনষ্টের ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিকর। কারণ ফড়িয়ার কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক স্থাপনা না থাকায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও উপকরণের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থার বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষিত। এছাড়া ফড়িয়াগন চিংড়ির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য বরফ ব্যবহার করেন না বললেই চলে। ফড়িয়াকে যা করতে হবেঃ

১। উপযুক্ত ডিজাইনের প্লাষ্টিকের পাত্রে চিংড়ি পরিবহন।
২। পরিবহনের সময় পর্যাপ্ত বরফ ব্যবহার।
৩। দ্রুত পরিবহনের কাজ শেষ করা।
৪। পরিবহন ও অন্যান্য কাজ শেষে সমস্ত সরঞ্জাম ও উপকরণ ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক (ব্লিচিং পাউডারের দ্রবন) দিয়ে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।
৫। পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার পর সরঞ্জাম ও উপকরণগুলিকে এমন স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে যেন পুনরায় সেগুলি নোংরা বা দূষিত না হয়।

চিংড়ি ডিপো/আড়তের জন্য করণীয়ঃ

ক) ভৌত অবকাঠামোঃ

১। ঘের বা খামার এর কাছাকাছি, ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের সুবিধা বিদ্যমান এমন জায়গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ডিপো নির্মান করা।
২। ডিপোর মেঝে পাকা, মসৃণ (মোজাইক হলে ভাল) ও কমপক্ষে ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু করা যাতে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে ডিপোর মধ্যে ঢুকতে না পারে।
৩। মেঝের উপর প্রায় ১ মিটার উঁচু স্টেইনলেস স্টিলের মসৃণ টেবিল রাখা।
৪। পশু-পাখি ও পোকা-মাকড় যাতে ঢুকতে না পারে সেজন্য ঘরে পাকা দেয়াল করা ও দরজা এবং জানালায় সূক্ষ তারের জাল লাগানো।
৫। কর্মীদের জন্য ডিপোর নিকটে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ ও তা নিয়মিত পরিষ্কার করা।
৬। ঘরে প্রবেশের পথে গামবুট বা প্লাষ্টিকের জুতা জীবাণুমুক্ত করার জন্য ফুট-ডিপ এর ব্যবস্থা রাখা।
৭। চিংড়ি নাড়াচাড়া করার আগে হাত জীবাণুমুক্ত করে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা।
৮। "চিংড়ি নাড়াচাড়া করার সময় ডিপোকর্মীরা তাঁদের মুখে, নাকে বা শরীরের কোন স্থানে হাত দিলে ঐ হাত পুনরায় জীবাণুমুক্ত করতে হবে"- এ মর্মে বিশেষ নির্দেশনার ব্যবস্থা রাখা।
৯। চিংড়ি ধোয়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ (ডিপ টিউবওয়েল) এবং ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা।
১০। ডিপো বা আড়তের আশপাশ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা থাকা।
১১। চিংড়ি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ডিজাইনের শক্ত প্লাষ্টিকের বাক্সের সরবরাহ থাকা।
১২। মরিচা পড়ে না এমন দাঁড়ি-পাল্লা, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা।
১৩। ভালমানের বরফের নিয়মিত সরবরাহ থাকা এবং বরফ সংরক্ষণের জন্য ইনসুলেটেড বাক্সের ব্যবস্থা রাখা।
১৪। ডিপো বা আড়তের মেঝে, দেয়াল, টেবিল, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশকের ব্যবস্থা রাখা।

খ) করণীয় কাজঃ

১। ঘের বা খামার থেকে সরবরাহ করা চিংড়ি উঁচু পাকা প্লাটফরম বা স্টেইনলেস স্টিলের টেবিলের উপর বিছিয়ে পচা ও নরম চিংড়ি বাছাই করে তা সরিয়ে ফেলা।
২। ডিপোতে চিংড়ির মাথা না ছাড়ানো; হ্যাসাপ নীতি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে চিংড়ির মাথা ছাড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
৩। 'বরফ-ঠান্ডা পানিতে' চিংড়িকে দ্রুত ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করা। কোন অবস্থাতেই চিংড়ি দীর্ঘক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে না রাখা।
৪। তাপ-নিরোধক প্লাষ্টিকের বাক্সে প্রয়োজনমত ও সঠিক নিয়মে কুচি বরফ মিশিয়ে চিংড়ি সাময়িকভাবে মজুদ রাখা।
৫। উপযুক্ত ডিজাইনের প্লাষ্টিকের বাক্সে পর্যাপ্ত বরফসহযোগে সঠিকভাবে প্যাকিং করে চিংড়ি দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রেরণ করা। পরিবহনে কত সময় লাগবে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্র কত তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণতঃ চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ১:১ । দিনের তাপমাত্রা ও দূরত্বের বিবেচনায় প্রয়োজনে বরফের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে।
৬। উপরের স্তরের চাপে নিচের চিংড়ি থেঁতলে যেতে পারে, তাই চিংড়ির বাক্স বা ঝুড়ির গভীরতা ৪৫ সেন্টিমিটারের বেশী হওয়া অনুচিত।
৭। চিংড়িসহ একটি ঝুড়ির উপরে আর একটি চিংড়ি ভর্তি ঝুড়ি সাজানো চিংড়ির জন্য খুবই ক্ষতিকর। তবে উপযুক্ত ডিজাইনের প্লাষ্টিকের বাক্সে তা খুব সহজেই করা যায়। প্লাষ্টিকের বাক্সে একটার উপর আর একটা- এভাবে একাধিক বাক্স সাজানো থাকলেও নিচের বাক্সের চিংড়ির কোন ক্ষতি হয়না।
৮। চিংড়ির বাক্সের ডিজাইন এমন হওয়া উচিত যেন উপরটি থেকে চোয়ানো পানি নিচের বাক্সের মধ্যে না পড়তে পারে।
৯। টাইফয়েড়, আমাশয়, ডায়রিয়া, সর্দি ও অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিংড়ি নাড়াচাড়া ও প্যাকিং করতে না দেওয়া।
১০।ডিপো বা আড়তের ভিতর চা বা কোল্ড ড্রিংকস্ পান করা, ভাত খাওয়া, পান খাওয়া, ধূমপান করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ।
১১।ডিপো বা আড়তের ভিতর সর্দি, থুথু, কফ বা কাশি না ফেলা।

বিঃদ্রঃ মাথা ছাড়ানো চিংড়ি গ্রহণ, ডিপোতে মাথা ছাড়ানো, মাঠ পর্যায়ের যে কোন স্থানে ওজন বাড়ানোর জন্য চিংড়ির দেহে ইনজেকশানের মাধ্যমে পানি, সাগুদানা বা বার্লি, আটা বা ময়দা, গোলানো সিমেন্ট বা অন্য যে কোন অপদ্রব্য পুশ করানো, লোহা বা কাঁচের টুকরা ঢুকানো এবং নরম ও তুলতুলে চিংড়িকে শক্ত দেখানোর জন্য চিংড়ির দেহে লোহা বা নারকেলের শলা ঢুকানো- এ সবই গুরুতর এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অবৈধ কাজের কারণে বিদেশে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

আকস্মিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা
Disaster management

ভূমিকাঃ

চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আকস্মিক বিপর্যয় প্রতিরোধ করা অথবা আকস্মিক বিপর্যের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রাহণ করা। যে কোন কারণে বিপর্যয় হোক না কেন, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে তার কিছুটা প্রতিকার করা সম্ভব। উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শেওলার আধিক্যজনিত সমস্যা, পাড়ে ছিদ্র হয়ে রোগ জীবাণু প্রবেশ, পানি ও মাটির গুনাগুণ সম্পর্কিত সমস্যা ইত্যাদি অতি সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

পানির গুনাগুণ ঃ

পানির গুনাগুণ সম্পর্কিত সমস্যা মারাত্মক ভাবে দেখা যায় দুই সময় যেমন-
- নার্সারীতে যখন পিএল/পোনা তিন সপ্তাহের বেশি রাখা হয়।
- ক্লোজচাষ পদ্ধতিতে যখন হেক্টর প্রতি খাবারের পরিমান ২০ কেজির অধিক হয়।

নার্সারীতে অক্সিজেন ঘাটতি জনিত সমস্যা ঃ

সাধারণত চাষীরা নার্সারীতে অতিরিক্ত খাবার দিয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত খাবারের অবশিষ্টাংশ তলায় জমে এবং অ্যানঅ্যারোবিক (Anerobic) অবস্থা সৃষ্টি করে। এর ফলে চিংড়ী অক্সিজেন স্বল্পতায় ভোগে, পানির উপর ভেসে আসে এবং অবশেষে মারা যায়।

প্রতিকার ঃ

- ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে নার্সারী থেকে চিংড়ি মুক্ত করে দেওয়া।
- নিয়মিত পানি খোলাত্ব পরিমাপ করা এবং যদি উদ্ভিদকণার (Alage/planktonic) পাতলা স্তর পড়ে তবে তা সরিয়ে ফেলা।

যদি কোনরকম মাটি ও পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয় তবে চিংড়ি চাপ/আঘাত পাওয়ার পূর্বে নার্সারী থেকে মুক্ত করা ভাল। তা না হলে পরবর্তীতে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চাষের পুকুরে অক্সিজেন সমস্যা ঃ

চাষের পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি জনিত সমস্যা মুলতঃ হঠাৎ করে শেওলা ধ্বংশ হওয়ার জন্য হয়ে থাকে। তাই শেওলার ঘনত্ব যাতে বেশী না হয় তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে।

প্রতিকারঃ

এই সমস্যা চাষী নিয়মিত ঘের পরিদর্শনের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে। যদি পানি খোলাত্ব ২০ সেন্টিমিটারের অধিক হয় তখন খাবারের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে। শেওলার ঘনত্ব (Plankton bloom) ঠিক রাখার জন্য চিটাগুড় ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া যদি সুযোগ থাকে তবে কৃত্রিম বাতাসের (Aretor) ব্যবস্থা করতে পারে। অথবা পাম্প মেশিনের সাহায্যে পানি পাম্প করতে পারে।

চাষী যদি কখনও সকাল বেলা তার ঘেরের চিংড়ি পানির উপরে উঠে আসতে দেখে এবং কোন মৃত চিংড়ি পাড়ের কাছে দেখতে পায় তবে তার উচিত হবে দ্রুত চিংড়ি আহরণ করা। কারণ এ থেকে বোঝা যায় তার পুকুরে মারাত্মক অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিয়েছে ফলে চিংড়ি মারা গেছে। তবে চিংড়ি পানির উপরে আসার পরও যদি কোন মৃত চিংড়ি পাড়ের কাছে দেখা না যায় তবে চাষী আসা

করতে পারে সূর্য উঠার পর এ সমস্যা দূর হবে। এরপরও চাষী ঘেরের মাঝখানে ঝাকি জাল মেরে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

ঘেরের পাড়ে ছিদ্রজনিত সমস্যা ঃ

পাড় তৈরীর সময় ঘাস/লতাপাতা সম্বলিত মাটি দিয়ে পাড় তৈরী করা উচিত নয়। লতাপাতা বা ঘাস কিছুদিন পর পচে যায় এবং ছিদ্রের তৈরী করে। ঘাস বা লতাপাতার সাথে যদি কোন কঠিন পদার্থ থাকে তবে ছিদ্র আরও বড় হয় এবং ঘেরের পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে তা আরও বড় হয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে।
ঘেরের পাড় এর কোন স্থান যদি পাকা বাড়ি অথবা ইটের সাথে যুক্ত থাকে তবে সেখানে ভালভাবে দরমুজ করতে হবে। চাষীকে নিয়মিত খামার পরিদর্শন করতে হবে এবং ছোট ছিদ্র দেখার সাথে সাথেই তা বন্ধ করতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ এ তা বড় হওয়ার সুযোগ না পায়।

যদি কোন কারণে ঘেরের পাড়ে ছিদ্রের ফলে বড় সমস্যা হয় তবে ছিদ্রের পাশ দিয়ে নেট স্থাপন করে পানির গভীরতা কমিয়ে ছিদ্র ভালভাবে বন্ধ করতে হবে।

মৌসুমি আবহাওয়ার তারতম্য ঃ

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষে অনেক সমস্যা হয় যখন মৌসুমের পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশে বছরে তিনটি মৌসুম আছে।

আগাম মজুদ ঃ

চাষীরা অনেক সময় জানুয়ারী ফেব্রুয়ারি মাসে এমনকি ডিসেম্বর মাসেও চিংড়ির পিএল ঘেরে মুজদ করে থাকে। এ সময় পানির তাপমাত্রা কম থাকে এবং চিংড়ীর বৃদ্ধি কম হয়। নিম্ন তাপ মাত্রায় চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রতিকার ঃ

এ সমস্যার সমাধান করতে হলে পানির তাপমাত্রা যখন ২৫° সেন্টিগ্রেডের উপর হবে তখন ঘেরে পোনা মজুদ করা উচিত।

উচ্চ তাপমাত্রা জনিত সমস্যা ঃ

মার্চ-এপ্রিল এবং জুন মাসে পানির তাপমাত্রা বেশি থাকে। তবে এ সময় চিংড়ি বৃদ্ধি ভাল হয়। কিন্তু অধিক তাপমাত্রার কারণে পানি গরম হযে যায়, অক্সিজেন কমে যায় এবং অনেক সময় চিংড়ি মারা যায়।

প্রতিকার ঃ

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য এমনভাবে ঘের প্রস্তুত করতে হবে যাতে ঘেরের গভীরতা কমপক্ষে ১ মিটার হয়। যদি ঘের অধিক গভীর করা সম্ভাব না হয় তবে চাষী ঘেরের নীচু এলাকায় পুকুর খনন করতে পারে। অথবা ঘেরের চারিদিকে নালা তৈরী করতে পারে।

মৌসুমি বৃষ্টি ঃ

আমাদের দেশে মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রচন্ড গরম থাকে এবং সাথে সাথে বৃষ্টিও শুরু হয়। বৃষ্টির কারণে ঘেরের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা কমে যায়। অনেক সময় ধরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় অক্সিজেন ঘাটতি হয়। দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির কারণে পানির পিএইচ এবং অ্যালকালিনিটি (Alkalinity) কমে যায়। পানির এই সমস্ত উপাদান পরিবর্তনের ফলে চিংড়ি তার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না এবং চিংড়ি আঘাত/চাপ খায় এটা খুব মারাত্মক সমস্যা এবং চাষীরা প্রতিনিয়ত এই সমস্যার সম্মুখীন হয়।

প্রতিকার ঃ

বর্ষা মৌসুমের শুরুতে পানির গভীরতা বাড়িয়ে এই সমস্যার আংশিক সমাধান করা যায়। পানির পরিবেশ বা গুনাগুন পরিবর্তনের সাথে পরিবেশেরও পরিবর্তন আনা যায় যেমন চুন/ডলোমাইট ব্যবহার করে পিএইচ/অ্যালকালিটি ঠিক রাখা যায়।

তলার কাদা ঃ

অতিরিক্ত খাবার অথবা অতিরিক্ত জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে ঘেরে পচা কালো দুর্গন্ধযুক্ত কাদার সৃষ্টি হয় যা বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার ঃ

প্রয়োজনীয় খাবার ও জৈব পদার্থ দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করে এর প্রতিকার করা যায়। যদি চাষী পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে তার ঘেরে পচা কালো মাটি জমা হয়েছে তবে সে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করেও তা দুর করতে পারে। পানির পিএইচ যদি কম হয় তবে তা থেকেও চাষী অনুমান করতে পারে যে তলায় পচা কাদার সৃষ্টি হয়েছে। যদি নালার ভেতর পচা কাদার সৃষ্টি হয় তাহলে পানি কমিয়ে কেবল মাত্র নালায় চুন প্রয়োগ করতে হবে। যদি খুব তাড়াতাড়ি ঘেরের অবস্থার উন্নতি না হয় তবে চাষীর উচিত হবে চিংড়ী আহরন করা।

চিংড়ির রোগের প্রাদুভার্ব মোকাবেলা করার উপায়ঃ

রোগের প্রাদুভার্ব/সংক্রমন হওয়ার সকল সতর্কতা অবলম্বন করার পরও চাষী রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়না। রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার সাথে সাথে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ যাতে চাষী বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় এবং প্রতিবেশি চাষীর উপর তার প্রভাব না পড়ে।

সতর্কতা/লক্ষণঃ

- যদি ঘেরে কোন দূর্বল চিংড়ি দেখা যায় তাহলে মনে করতে হবে যে ঘেরের চিংড়ি আঘাত/চাপ খেয়েছে এড়্গাং রোগের আক্রমণ হতে পারে।
- আবহাওয়ার পরিবর্তন বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে আকাশ মেঘাছন্ন ও বৃষ্টি হওয়া।
- পানির রং পরিবর্তন হওয়া।
- হঠাৎ করে ঘেরের তলায় পচা ও দূর্গন্ধ যুক্ত কাদা জমা হওয়া।
- চিংড়ি ঘেরের পাড়ে আসা এবং দূর্বল ও মৃত চিংড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- মাটি ও পানি পরীক্ষা করা এবং কোন অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে তা দ্রুত দূর করার ব্যবস্থা করা।
- মৃত চিংড়ি সরানো এবং ঘের থেকে দূরে গর্ত করে পুতে রাখা।
- যদি মৃত চিংড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং চিংড়ির খাবার গ্রহণ না করে তবে দ্রুত চিংড়ি আহরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চিংড়ি আহরণ ঝাকিজাল দিয়ে করা এবং সংক্রামিত পানি প্রধান নদীতে না ফেলা উচিত ।
- রোগের আক্রমণ সম্পর্কে প্রতিবেশী চাষীদের অবহিত করা।
- প্রতিবেশী চাষীর ঘেরে যাতে রোগের সংক্রামণ না হতে পারে তার জন্য প্রতিবেশী চাষীদের রোগ সম্পর্কে অবহিত করা এবং দুষিত পানি অপসারণের তারিখ এবং সময় সম্পর্কে জানানো।
- প্রতিবেশী চাষীরা যাদে রোগাগ্রস্থ খামারের কোন উপকরণ যেমন জাল, ট্রাংক, নৌকা পাম্প ইত্যাদি ব্যবহার না করে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া ।
- পানির গুনাগুণ ঠিক রাখার জন্য খাবার বন্দ করে দিতে হবে। পানির পিএইচ ৭.৫ এর উপরে রাখার জন্য চুন ব্যবহার করতে হবে।
- এক খামার থেকে অন্য খামারে যাতে রোগের বিস্তার না হয় তার জন্য প্রতিবেশী চাষীদের একসাথে বসে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।